পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা | ৩০ শাহাদত ১৩৭৭ হিঃ শাঃ | ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ ঈসাব্দ

প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম

প্রফেসর ডঃ আবদুস সালামকে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের সনদ

রাবওয়ায় মরহুম প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম-এর নামাযে জানাযা আদায়ের দৃশ্য

তিনি আসলেন , বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে কম্পন সৃষ্টি করলেন এবং প্রভুর নিকট ফিরে গেলেন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ইটালীতে 'আব্দুস সালাম' দিবস পালিত

ইটালীতে ফিজিক্স বিশ্বে সর্বাধিক বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিকাল ফিজিক্স-এর পক্ষ থেকে গত ১৯শে নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর '৯৭ একটি বাৎসরিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ রচনা পাঠ করেন। এ উপলক্ষ্যে কনফারেন্সের একটি দিনকে **আব্দুস সালাম স্মরণ দিবস** হিসেবে পালন করা হয়। এতে উক্ত সংঠনের ডাইরেক্টর প্রফেসর Migual Virasoro এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, ডঃ আব্দুস সালামকে সর্বাধিক বেশী সম্মানিত করা হবে যদি আমরা এ সংগঠনের নাম আব্দুস সালামের নামে **আব্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স** নামকরণ করি। এ প্রস্তাবকে সকল প্রতিনিধির পক্ষ থেকে সোৎসাহে স্বাগত জানানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সম্মেলনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-ইমাম ও খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর নিকট বাণীর জন্যে আবেদন করেন সংগঠনের ডাইরেক্টর প্রফেসর M. A. Virasoro। হুযূর (আইঃ) একটি বাণী প্রেরণ করেন এবং এ বিশেষ বাণীটি পাঠ করেন মরহুম ডঃ আব্দুস সালামের পুত্র মোকাররম আহমদ সালাম ২১ নভেম্বর '৯৭ তারিখে অর্থাৎ আব্দুস সালাম স্মরণ দিবসে, আলহামদুলিল্লাহ্। (সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান: ১৯-৩-৯৮)।

বিভিন্ন জামাতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া)- গত ১৩ ও ১৪ই মার্চ '৯৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাসেরাবাদ-এর সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মাওলানা সালেহ আহমদ, এডভোকেট মাহবুব আজম রেজা, জনাব মুজিবুর রহমান, মোয়াল্লেম আমীর হোসেন প্রমুখ। প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন।

উথলী (চুয়াডাঙ্গা) : আহমদীয়া মুসলিম জামাত উথলীর সালানা জলসা গত ১৫ই মার্চ'৯৮ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় বক্তব্য প্রদান করেন ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম, মাষ্টার আব্দুল গফুর, এডাভোকেট মাহবুব আজম রেজা, মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ শরীফ ও মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। অধিবেশনের শেষে মনোজ্ঞ প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। এ জলসায় এবারই প্রথম মহিলাদের ব্যবস্থা করা হয়। দেড় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম ঃ গত ২৭ ও ২৮ শে মার্চ '৯৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শত শত সদস্য ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, ক্রোড়া ও ঢাকা জামাতের সদস্যও যোগদান করেন।

চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী এই জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব মাওলানা সালেহ্ আহমদ, এ কে, রেজাউল করীম, মোবাশ্বেরুর রহমান (আমীর চট্টগ্রাম), এস, এ, নিজামী, হাফেয সেকান্দার আলী প্রমুখ। প্রতিদিন বাদ মাগরিব তবলীগ অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের পর বয়াত অনুষ্ঠান হয়।

দুর্গারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ঃ গত ২৭ ও ২৮ শে মার্চ '৯৮ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত দুর্গারামপুরের ১৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহিলা সহ ৪০০ জন যোগদান করেন। এতে বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, ফজল-ই-ইলাহী, এডভোকেট মাহবুব আজম রেজা, ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন, মোয়াল্লেম শাহ আলম খান, হাফেয আবুল খায়ের ও মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, নারায়ণগঞ্জ, ঘাটুরা ও তেজগাঁ জামাত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা ও খুলনা, খালিশপুর হালকাও যথাযথভাবে মসীহ মাওউদ দিবস পালন করেছে।

আহমদী বার্তা

আমরা মুবাহালার বছরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। সুতরাং এ বিষয়টিকে সামনে রেখে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত নিদর্শন দেখার মানসে মহান আল্লাহ্তাআলার নিকট দোয়া করা কর্তব্য। দোয়ার কবুলিয়তের জন্যে আমাদের অন্তর শিরক মুক্ত নির্মল-নির্ভেজাল হওয়া দরকার। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিগত দিনগুলোর খুতবা মনযোগ দিয়ে এবং বার বার শুনা ও পাঠ করা উচিত। তিনি আমাদের অভ্যন্তরভাগকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার জন্যে ক্রমাগত হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সাল্লামের উদ্ধৃতিসমূহের ওপরে আলোকসম্পাত করে আমাদের বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমাদের হৃদয় যেন কেবল তাকওয়া ও খোদার ভালবাসায় ভরপুর থাকে। তাহলে আমাদের দোয়ায় বিশেষ শক্তি লাভ হয়ে অসাধ্য সাধন করবে। সুতরাং আমাদের আত্মাগুলোকে নির্মল ও পবিত্র করার লক্ষ্যে আমরা যেন নামায ও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্তালার সাহায্য কামনা করতে থাকি। তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছরের ছয় মাস গত হয়ে গেছে। এখনও বহু জামাত থেকে চাঁদার ওয়াদা আসে নি বা সঠিকভাবে ওয়াদা আসে নি। তাই আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে **তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ** পালন করে তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে প্রত্যেক জামাতকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। সপ্তাহ পালন শেষে যথারীতি ওয়াদাসহ রিপোর্ট পাঠাতে বলা হচ্ছে।

আগামী জুন মাসের ১২-১৩ তারিখে ন্যাশনাল মজলিসে শূরার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। খেলাফত ব্যবস্থায় শূরার মাধ্যমে সংগঠনের উন্নতির জন্যে কর্মসূচী তৈরী করা এবং বাস্তবসম্মত প্রস্তাবাদি পেশ করার সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেক জামাতকে এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে শূরার প্রস্তাবাদিসহ প্রতিনিধি নির্বাচন করে পেশ করার জন্যে বলা হয়েছিলো। যেসব জামাত এখনও তা পাঠান নি তাদেরকে সত্বর এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

লাযেমী চাঁদার বছরের আর মাত্র ২ মাস বাকী। সুতরাং প্রত্যেক জামাতকে যথারীতি হিসাব দেখে প্রত্যেক চাঁদা দাতার নিকট থেকে রীতিমত চাঁদা আদায়ের দিকে মনযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে। যারা মোটেই চাঁদা দিচ্ছেন না তাদের তালিকা প্রণয়ন করে সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করুন যাতে কেন্দ্রীয় ওফদ (প্রতিনিধি)পাঠিয়ে তাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব সম্বন্ধে বুঝান যায় এবং তাদের চাঁদা আদায় করতে সহযোগিতা করা যায়। মনে রাখা উচিত যে, সময় মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বছর শেষে বকেয়াদারগণের বোঝা জামাতের স্কন্ধে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার তৌফীক দান করুন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ২ মহররম ১৪১৯ হিঃ কাঃ
৩০ শাহাদত ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

'মুবাহালা' হেলার নয়

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত এর জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহ্‌র সুন্নত মোতাবেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। প্রায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে এর বিরুদ্ধে অপবাদ, মিথ্যারোপ এবং কুফরী ফত্‌ওয়া লাগানো হয়েছে ও হচ্ছে। পরিশেষে যুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে এবং ইহা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, মানবাধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার থেকে এ জামাত হয়েছে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত। দুনিয়ার বিচারের সকল দ্বার এর জন্যে রুদ্ধ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিশ্ব-বরেণ্য নেতা ও খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ১৯৮৮ সনের ১০ই জুন তারিখে সকল আহ্‌মদীদের তরফ থেকে সারা দুনিয়ার বৈরী, মিথ্যা আরোপকারী এবং কুফরী ফত্‌ওয়া দানকারীদের বিরুদ্ধে মুবাহালার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিষয়টি আহ্‌কামুল হাকেমীন আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে পেশ করেছেন, যেন আল্লাহ্‌তাআলা ১ বছর সময় সীমার মধ্যে স্পষ্টভাবে সারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেন, কারা মিথ্যাবাদী এবং কারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতার হাত কাদের সাথে রয়েছে, কারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।

১০ই জুন মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদানের পর নাটকীয়ভাবে মৃত (!) মৌলানা আসলাম কুরায়শীর জীবিত হওয়া এবং পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা আমরা জবরদস্ত ঐশী-নিদর্শন দেখলাম।

এত বড় নিদর্শনাবলী দেখার পরেও বিরুদ্ধবাদীরা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলেও পুরোপুরি তাদের ন্যাক্কারজনক অনৈসলামিক ও অমানবিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়নি। সুযোগ পেলেই তারা তাদের হিংস্র থাবা বের করে আহমদীয়তকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চালায়। তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৯৯৭ সনের ১০ই জানুয়ারী মুবাহালার চ্যালেঞ্জের পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, আমাদের বিরুদ্ধবাদী বৈরীরা এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করুক এবং অভিযোগসমূহ উল্লেখপূর্বক আমার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী –'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্য ঘোষণা দিক, এরপর এক বছর অপেক্ষায় থাকুক আর দেখুক আল্লাহ্‌ কোন্ পক্ষকে আশীর্বাদ করেন আর কোন্ পক্ষকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেন। আমরা নিশ্চিত যে, এর প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতেও আমরা নিদর্শনাবলী দেখতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্‌। অতীতেও আহমদীয়তের বিরুদ্ধে যারা দণ্ডায়মান হয়েছেন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন।

মুবাহালার মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধবাদী বৈরীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক এটা আমাদের কাম্য নয়। কেননা, তারা ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌কে মানবে কে? আমরা আশা করি এ মুবাহালার পর তাদের বোধোদয় হবে। দেখা গেছে বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণতঃ মুবাহালা গ্রহণ করে না, নানা রকম বাহানা করে তা এড়িয়ে যেতে চান' অথচ অন্তর্যামী আল্লাহ্‌তাআলা কিন্তু সবই জানেন, সবই দেখেন।

'মুবাহালা' অর্থ অতি বিনয়ের সাথে দীর্ঘ দোয়া করা। মুবাহালার মাধ্যমে এই দোয়া করা হয় যেন মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়। তাই আমরা মনে করি মুবাহালার গুরুত্ব যতটা না বিরুদ্ধবাদীর জন্যে তার চেয়ে বেশী আমাদের জন্যে। আমরা যুগ-ইমামের হাতে বয়াত নিয়ে যদি বয়াতের শর্তাবলীর উপর সত্য বলে প্রতিষ্ঠিতও প্রমাণিত না হতে পারি তা হলে এ মুবাহালার ভয়ঙ্কর পরিণতি আমাদেরকেও ক্ষমা করবে না। তাই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে হুযূর আকদস (আইঃ) জামাতকে এই বলে হুশিয়ার করেছেন যেন জামাত নামায এবং আমল ও আখলাকের ময়দানে দুর্বলতা না দেখায়। তিনি জমাতকে এই বলে হুশিয়ার করেছেন – যদি জামাত তাদের আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখতে না পারে তাহলে তিনি তাদের জিম্মাদার হবেন না। হুযূর (আইঃ) এ হুশিয়ারীও উচ্চারণ করেছেন – আমাদের অবস্থা যেন বনী ইসরাঈলের মত না হয়। বনী ইসরাঈল তার নেতার কথা অমান্য করে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল আমরা যেন আমাদের নেতার আদেশ পালন না করে সেই অবস্থার সম্মুখীন না হই। এতদ্ব্যতিরেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বিগত কিছুদিন থেকে খুতবার জামাতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আইঃ)-এর মূল্যবান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখা থেকে উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপন করে আহমদীদের হৃদয়গুলোকে শিরকমুক্ত করতে এবং তাক্‌ওয়া ও আল্লাহ্‌-প্রেমে ভরে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা যেন যুগ খলীফার মূল্যবান খুতবাসমূহ শুনে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করি। আল্লাহ্‌তালা আমাদের সকলকে ইমামে ওয়াক্তের কথা পুরোপুরি পালন করার এবং মুবাহালার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার তৌফীক দান করুন, আমীন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ ভাই-এর সাহায্য করা	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃতবাণীঃ প্রকৃত আহমদী কে? হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ কিশতিয়ে নূহ পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৫
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ–জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	৬-৮
❑ জুমুআর খুতবাঃ খোদা-প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পন্থা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯-১৫
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল– হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ–জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৬
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত মূল– আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী	ঃ অনুবাদ–মরহুম এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার	১৭-১৮
❑ উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৯
❑ ছবি কথা বলে	ঃ	২০-২১
❑ আব্দুস সালামঃ তৃতীয় বিশ্বের স্বপ্নদ্রষ্টা	ঃ আব্দুল্লা আল মূতী	২২-২৪
❑ জুমুআর খুতবাঃ প্রকৃত মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যাবলী হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫-৩১
❑ ছোটদের পাতাঃ শমায়েল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ পরিচালক– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩২-৩৩
❑ জুমুআর খুতবাঃ সহজ হিসাব প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা বশীরুর রহমান	৩৪-৪০
❑ প্রচ্ছদ পরিচিতি	ঃ প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম	

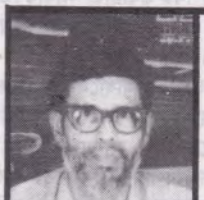

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের আব্বা মোহতারম মৌঃ আহসান উল্লাহ পাটওয়ারী সাহেব গত ৩রা এপ্রিল রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নেওয়ার পথে রংপুর হতে প্রায় পাঁচ মাইল যাওয়ার পর পরের দিন বেলা ১২-২০ মিনিটের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ..... রাজেউন)। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬১ বৎসর। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে ও ২ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও দারাজাতের বুলন্দির জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার জন্য বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছেন মরহুমের স্ত্রী ও সন্তানগণের পক্ষে বড় ছেলে মাহমুদ আহমদ শরীফ।

বিশেষ দোয়ার আবেদন

পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ খান জামাতের একজন একনিষ্ঠ নির্ভিক নীরব কর্মী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জমাতের সেবা করেছেন। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর পূর্ণ রোগ মুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘজীবনের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

আতফালুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম এ বছরের সালানা জলসায় একটি টি-ষ্টল স্থাপন করে যে লাভ করে তাথেকে ৫০০/- (পাঁচশ') টাকা মসজিদ ফান্ডে চাঁদা দেয়। আলহামদুলিল্লাহ্। এ পদক্ষেপ খুবই প্রশংসনীয়, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ও অনুকরণীয়।

পাক্ষিক আহমদী

কুরআন মজীদ

সূরা আন্ নিসা—৪

১৭০। জাহান্নামের পথ ব্যতিরেকে সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস করিবে। আর আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

১৭১। হে মানবমণ্ডলী। অবশ্যই এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করিয়াছে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে,) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র; প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দান সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহ্‌র একজন রসূল মাত্র, এবং তাঁহার কালাম[৭১১](-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে একটি রূহ[৭১২] (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, '(আল্লাহ্) তিন।' তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ। তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাঁহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁহার; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (২৩ রুকূ)

১৭৩। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘৃণা বোধ করে না, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফযল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

১৭৫। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ[৭১৩] আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক[৭১৪] নাযেল করিয়াছে।

১৭৬। বাকি রইল তাহাদের অবস্থা যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মযবুতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফযলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিবেন।

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালালাহ্ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, আল্লাহ্ কালালাহ্[৭১৫] সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি কোন ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে, এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতা ও ভগ্নীর হয়— পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আল্লাহ্ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাও, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৭১১। এখানে ৪১৪ টীকা উপস্থাপন করা হইলঃ

'কলিমা' মানে একটি অর্থবোধক শব্দ, বাক্য ও কথা, একটি অনুশাসন, একটি আদেশ (মুফ্‌রাদাত)। এই কলিমা শব্দটি, ৪ঃ১৭২ আয়াতে উল্লেখিত 'রূহ্' শব্দের সহিত মিলিত হইয়া, স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) না ছিলেন আল্লাহ্, আর না ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও পুত্রত্বকে এই শব্দগুলি প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে উহাকে বরং ধূলিসাৎ করে। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র বাক্য' বলা হইয়াছে; কারণ তাহার বাক্য ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। যে ব্যক্তি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সত্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন, তাহাকে বলা হয় 'সাইফুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র তরবারী) বা আসাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সিংহ)। তেমনিভাবে, ঈসা (আঃ)- কে 'কলিমাতুল্লাহ্' বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন নাই বরং আল্লাহ্‌র আদেশ-বাক্য সরাসরি তাঁহাকে মাতৃগর্ভে আনিয়াছে (১৯ঃ২২)। অধিকন্তু, উপরে প্রদত্ত শব্দার্থগুলি ছাড়াও, কুরআনে নিম্নলিখিত অর্থেও 'কলিমা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে যথাঃ (১) চিহ্ন বা নিদর্শন (৬৬ঃ১৩; ৮ঃ৮); (২) শাস্তি (১০ঃ৯৭); (৩) পরিকল্পনা (৯ঃ৪০); (৪) সুসংবাদ (৭ঃ১৩৮); (৫) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি (১৮ঃ১১০); (৬) কেবল মুখের কথা (২৩ঃ১০১)। এই সব অর্থের কোন একটিও যীশুকে অন্যান্য নবীর চাইতে উচ্চ মর্যাদা দান করে না। তদুপরি, যীশু বা ঈসা (আঃ)-কে কুরআনে 'কলিমা' (শব্দ) বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-কে 'যিক্‌র' (গ্রন্থ বা বক্তৃতা) বলা হইয়াছে (৬৫ঃ১১,১২) যাহা বহু বহু 'কলিমা'র সমষ্টি। বস্তুতঃ, কলিমাতুল্লাহ্‌র অর্থ যদি আমরা 'আল্লাহ্‌র শব্দ বা বাক্য'ই ধরিয়া লই, তাহা হইলেও, খুব বেশী বলিলে আমরা এইটুকুই বলিতে পারি যে, আল্লাহ্ নিজেকে ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যেমন তিনি অন্যান্য নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। শব্দাবলী আর কিছুই নয়, ভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। শব্দ আমাদের সত্তার অংশ নহে, তাই ইহা সশরীরী হইতে পারে না।

৭১২। 'রূহ্' অর্থ আত্মা; যে শ্বাস মানুষের শরীরকে জীবন্ত রাখে এবং যাহা বাহির হইয়া গেলে মৃত্যু ঘটে, ঐশীবাণী বা প্রেরণা, কুরআন; ফিরিশ্‌তা, সুখ ও আনন্দ, করুণা (লেইন)। 'রূহ্' ও 'কলিমা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ঈসা (আঃ) আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক হইতে অন্য নবীদের তুলনায় কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী নহেন। এই ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গি অন্যান্য নবীগণ ও পুণ্যাত্মাগণের (যথা মরিয়মের) জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে (১৫ঃ৩০, ৩২ঃ১০; ৫৮ঃ২৩)। এই সব শব্দ ঈসা (আঃ) ও মরিয়মের স্বপক্ষে, ইহুদীদের ঘৃণ্য অপবাদগুলি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক মার্গের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দানের উদ্দেশ্যে নয়।

৭১৩। 'সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ' দ্বারা কুরআনকে বুঝাইয়াছে, যাহার মধ্যে মহান ও স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদি রহিয়াছে, অথবা নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে, যিনি নিজের জীবনে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই শিক্ষাগুলি মানব জাতির জন্য মঙ্গল ও আশীর্বাদ বিশেষ।

৭১৪। 'উজ্জ্বল (পরিষ্কার) আলো' দ্বারাও হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অথবা কুরআনকে বুঝাইয়াছে।

৭১৫। ৪ঃ১৩ আয়াতে এক ধরনের 'কালালাহ্'র কথা বলা হইয়াছে, যে পিতা-মাতাহীন ও সন্তানবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং কেবল মাতার গর্ভজাত ভাই-বোন রাখিয়া যায়, পিতার ঔরসজাত কেহ থাকে না। আলোচ্য আয়াতে অপর ধরনের 'কালালাহ্'র কথা বলা হইতেছে যে, সন্তানহীন ব্যক্তি কেবল পিতার তরফ হইতে বা পিতা-মাতার তরফ হইতে ভ্রাতা-ভগ্নী রাখিয়া যায়। এই আলোচ্য আয়াতটিকে ৪ঃ১৩ আয়াতের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক কারণেই প্রথমোক্ত ভ্রাতা-ভগ্নীগণ শেষোক্ত ভ্রাতা ও ভগ্নী হইতে উত্তরাধিকার হিসাবে কম অংশ পাইবেন। উত্তরাধিকার আইনের এই ধারাটিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের বহুবিধ অপবাদ ও অন্যায়াচরণের দীর্ঘ আলোচনার পর, কুরআন সূরাটির শেষপ্রান্তে আসিয়া, আবার 'কালালাহ্'র উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইহাতে 'কালালাহ্'র উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইন হওয়া ছাড়াও, ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারবিহীন অবস্থা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কেননা, তিনিও এক ধরনের 'কালালাহ্' ছিলেন। ঈসা (আঃ) পিতার মধ্যবর্তীতায় জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীও রাখিয়া যান নাই। ইবনে আব্বাস 'কালালাহ্'-এর সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, সে-ই কালালাহ্। ঈসা (আঃ) যেহেতু কোন আধ্যাত্মিক খলীফা রাখিয়া যান নাই, সেইহেতু তিনি আধ্যাত্মিকভাবেও 'কালালাহ্'।

হাদীস শরীফ

ভাই-এর সাহায্য করা

কুরআন :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

অর্থঃ এবং যদি মু'মিনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করাবে, যদি (মীমাংসার পরে) উভয়ের মধ্য থেকে একদল অপর দলের ওপরে বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, তাহলে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভাল বাসেন (সূরা হুজুরাত : ১০ আয়াত)।

হাদীস ঃ

আন আনাসিন ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা উনসুর আখাকা যালেমান আও মাযলুমান ক্বলু ইয়া রসূলাল্লাহে হাযা নানসুরুহূ মাযলুমান ফাকায়ফা নানসুরুহূ যালেমান তা'খুযু ফাওকা ইয়াদায়হে (বুখারী)।

অর্থাৎ ঃ- হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারিত হোক অথবা অত্যাচারী। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্যের কথা তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কী? তিনি (সাঃ) বললেন, অত্যাচারী ভাই-এর সাহায্য করার অর্থ হলো তাকে অত্যাচার হতে নিবৃত্ত রাখা (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ- উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে ঝগড়া বা যুদ্ধের সূচনা হলে কি করতে হবে এ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের আরেকটি দিক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, যা ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিক শিক্ষার এক অপূর্ব রূপ। ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রথম শিক্ষা হলো প্রত্যেক মুসলমান ভাই-এর সাহায্য করতে হবে। যদিও বা সে হোক নির্যাতিত অথবা অত্যাচারী। ভ্রাতৃত্ববোধ এমন বিষয় নয় যাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। ভাই হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় হলো পৃথিবী হতে অন্যায় ও অবিচার মিটিয়ে পুণ্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সাধারণভাবে নেন নি। বরং ইহাকে এক পবিত্র বন্ধন ও সম্পর্ক বলে আখ্যা দিচ্ছেন। ভাই, হোক না দুষ্ট মন্দ-অত্যাচারী বা অত্যাচারিত সে ভাই-ই থাকবে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তো ছিন্ন হবে না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলছেন, তোমার ভাই যদি অত্যাচারী হয় তবে তুমি তোমার সাহায্যের রূপ পরিবর্তন কর। তাকে ধর, বুঝাও এবং বল, ইসলাম অন্যায়ের অনুমতি দেয় না। আমি তোমাকে যুলুম করতে দেব না। খোদার অসন্তুষ্টি অর্জন কর আমি তা চাই না। আমি তোমার কল্যাণকামী।

উপরোক্ত কুরআনী আয়াত ও হাদীস আমাদিগকে যে শিক্ষা দিচ্ছে আমরা যেন সবাই উহার উপর আমল করি। তবেই আমাদের মাঝে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে ইহার উপর আমল করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ

দাতব্য হোমিও ক্লিনিক স্থাপন

মা. খো. আ. মিরপুর এর উদ্যোগে মিরপুর মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি দাতব্য হোমিও ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। গত ২০ মার্চ থেকে এ ক্লিনিকে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়। আপাতত: সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চিকিৎসা করা হচ্ছে। রোগীদের নিকট থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো ব্যাপক আকারে যাতে চালু করতে পারেন এ জন্য সকলের দোয়া কামনা করছেন জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, নায়েব কায়েদ-১, মঃ খোঃ আঃ মিরপুর।

কাবিনের মোহরানা বৃদ্ধি

আয় বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে আমি জাহাঙ্গীর মোরশেদ আলম (নাসের উদ্দীন) ২৭, কদমতলা, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪, মতিঝিল, আমার স্ত্রী মিসেস জেসমিন ফারুকী, পিতা-মরহুম আব্দুল আলীম, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর মোহরানা ২৪,০০১/= (চব্বিশ হাজার এক) টাকা থেকে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকায় বৃদ্ধি করলাম। আল্লাহ্‌তাআলা ইহাকে বা-বরকত করুন।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, গত ২২/৬/৯০ ইং তারিখে ২৪,০০১/=(চব্বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে আমাদের বিয়ে সু-সম্পন্ন হয়েছিল।

শোক সংবাদ

আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান বেগম আরশের নেছা গত ১৮/০৩/৯৮ইং রোজ বুধবার বিকাল ২-৩০ মিনিটে তাদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার মন্দাভাগে আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও তার রেখে যাওয়া পরিবারের সকলকে আল্লাহ্‌তাআলা যেন সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য দোয়ার আকুল আবেদন করছি আমি মোহাম্মদ বোখারুল ইসলাম বোখারী।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার মেয়ে নাজিফা তাসনীম (রিদম) হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার হরিশ্যামা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ট্যালেন্ট পুলে ১৯৯৭ সনের সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

তার জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য জামাতের ছোট বড় সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছেন।

এম. এ. তালেব, লোকনাথ দীঘির উত্তর পাড়
পশ্চিম পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অমৃত বাণী

প্রকৃত আহমদী কে?

মূল: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)

"পরিশেষে আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি তোমরা কখনও এরূপ চিন্তা করিবে না যে, 'আমরা তো বাহ্যিকভাবে বয়াত গ্রহণ করিয়াছি'।

বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়ীত্ব মুক্ত হইতেছি যে, **পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না**। আল্লাহ্‌তাআলার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতারণা পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। **যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে।** যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা-মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ-দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ এবং তদ্রূপ অন্যান্য না-জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কু-প্রভাব বিস্তারকারী কু-সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয় যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়ীত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। সে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। **যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যাহা বয়াত করিবার সময় করিয়াছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে।** যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর, আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে।

এই সমুদয় কাজ বিষবিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে অবস্থান করিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতায় পূর্ণ এবং যে খোদার সহিত সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখে না, সে কখনও সেই আশীষের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা পবিত্রচেতা লোকদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হইতে নির্মল করেন এবং আপন খোদার সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ, তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ, কারণ তাঁহারা খোদাতাআলার ক্রোড়ে উপবিষ্ট এবং খোদাতাআলা তাঁহাদের সহায় আছেন।

কাহারা খোদার উপর ঈমান আনিয়াছেন? কেবল তাঁহারাই, যাহারা উক্ত রূপ। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী দুরাত্মা ও দুরাশয় ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তিত থাকে,– কারণ সে-তো নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে কখনও এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই যে, খোদাতাআলা সাধু ব্যক্তিদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছেন, বরং তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্যকল্পে সর্বদাই মহানিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও প্রদর্শন করিবেন। সেই খোদা, অতীব বিশ্বস্ত খোদা। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, দুনিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে, কিন্তু খোদাতাআলা, যিনি তাহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। **কতই সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না।** আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। সারা বিশ্বের খোদা তিনি-ই, যিনি আমার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন, আমার স্বপক্ষে মহানিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নাই, না-আকাশে, না-পৃথিবীতে। যে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং হতাশা ও দুঃখে আক্রান্ত। আমি আমার খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি সমস্ত বিশ্বের খোদা এবং তিনি ছাড়া আর কেহই নাই। কীরূপ সর্বশক্তিমান ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা যাহাকে আমি লাভ করিয়াছি! কি মহাশক্তির অধিকারী সেই খোদা যাহাকে আমি দর্শন করিয়াছি! সত্য ইহাই যে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্ত কেতাব ও প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ নেচারী বা নাস্তিকদের মত হইও না যাহারা নিজেদের খেয়ালের বশে এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, যাহার প্রতি খোদাতাআলার কেতাবের কোন সমর্থন নাই। কেননা, তাহারা বিতাড়িত ও প্রত্যাখ্যাত। তাহাদের দোয়া কখনও কবুল হইবে না। তাহারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে, তাহারা মৃত, জীবিত নহে। তাহারা খোদার সম্মুখে নিজেদের রচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁহার অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে এবং তাহাকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দন্ডায়মান হও, তখন তোমাকে এই দৃঢ়-বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সকল বিষয়েই শক্তিমান। তবেই তোমার দোয়া কবুল হইবে এবং তুমি খোদাতাআলার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি"।

(কিশতিয়ে নূহ বাংলা পুস্তক থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩০-৩২)

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা আমার সমর্থনে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশ করেন। খুব কম মাসই অতিবাহিত হইয়াছে যখন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। স্বয়ং খোদা দুশমনদের মোকাবেলায় তলোয়ার উঠাইয়া আমার জন্য তাহাদের মোকাবেলা করেন। যাহারা আমার বিরুদ্ধে কোন আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছে, অবশেষে তাহাদের কপালে পরাজয় ও লাঞ্ছনা জুটিয়াছে। যাহারা আমার সহিত মুবাহালা করিয়াছে, অবশেষে তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইয়াছে বা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এই সকল সাহায্য-সমর্থন এই গ্রন্থ হাকীকাতুল ওহীতে নমুনাস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বাবু এলাহী বক্‌স সাহেবের এই ইলহাম যে, আমার ও তাহার মধ্যকার পারস্পরিক অভিসম্পাতের ফলাফল এই হইবে যে, সকল ধ্বংসলীলা ও বিনাশ আমার কপালেই জুটিবে এবং তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়া যাইবে-এখন আমাকে ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বলুন তাহার এই ইলহাম কি সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে? এই মুবাহালার ফল কি তাহার অনুকূলে হইয়াছে না কী আমার অনুকূলে হইয়াছে? অভিসম্পাতের কুপ্রভাব কি আমার উপর পড়িয়াছে না কী তাহার উপর পড়িয়াছে? পাঠকগণ, এই ব্যাপারে কিছু চিন্তা করুন যাহাতে খোদা আপনাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নতুবা খোদাতাআলা এখনো তাঁহার সাহায্য-সমর্থন ও তাঁহার নিদর্শনাবলী শেষ করিয়া দেন নাই। তাঁহার সত্তার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না। অতএব হে লোক সকল! যাহারা আমার আওয়াজ শুনিতেছ তাহারা খোদার ভয় কর ও সীমা অতিক্রম করিও না। যদি এই পরিকল্পনা মানুষের হইত তবে খোদা আমাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন এবং এই সকল ঘটনার নাম-নিশানাও থাকিত না। কিন্তু তোমরা দেখিয়াছ খোদাতাআলার সাহায্য কীভাবে আমার সাথে থাকিতেছে এবং এত নিদর্শন অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা গণনা করা যায় না। দেখ, কত দুশমন আমার সহিত মুবাহালা করিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হে খোদার বান্দারা! কিছুতো ভাব। খোদাতাআলা কি মিথ্যাবাদীদের সহিত এইরূপ আচরণ করেন। কোন কোন নির্বোধ বলে, আথম তাহার মেয়াদের মধ্যে মরে নাই। কিন্তু তাহারা জানে (আথম) মরিয়াতো গিয়াছে এবং আমি এখনো জীবিত আছি। শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী, যাহাতে কাহারো উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ওয়াদা থাকে, ঐগুলি মেয়াদের মধ্যে পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। বরং সতর্ককৃত ব্যক্তি যদি তওবা করে বা প্রত্যাবর্তন করে তবে উহা পূর্ণ হওয়াও জরুরী হয় না। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাবর্তন, তওবা, সদকা ও খয়রাত দ্বারা টলিতেও পারে এবং টলিয়া আসিতেছে। কুরআন করীম ও পূর্ববর্তী কেতাবসমূহ এই বিষয়ের সাক্ষী। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী। কোন ব্যক্তির কৃত-কর্মের ফলস্বরূপ খোদাতাআলা যখন ইচ্ছা করেন, তাহার উপর বিপদ অবতীর্ণ করেন, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, তিনি ঐ বিপদকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তওবা, ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা), সদকা ও খয়রাত- এর দরুন রদ করিয়া থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া খোদাতাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার উপর করুণা করা হইয়া থাকে, যেভাবে ইউনুস নবী (আঃ)-এর জাতির বিপদ কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমগ্র জগদ্বাসী জানে যে, তওবা, ইস্তেগফার, সদকা ও খয়রাত দ্বারা বিপদ কাটিয়া যাইতে পারে। শাস্তি অর্থাৎ আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী ইহা ছাড়া আর কি যে উহাও একটি বিপদ, যাহা আল্লাহ্‌র কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের মাধ্যমে অবহিত করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে যদি এই কথা সত্য হয় যে, তওবা, ইস্তেগফার, সদকা ও খয়রাতের দরুন বিপদ কাটিয়া যাইতে পারে তবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কেন টলিতে পারে না, যাহার সংবাদ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে? এতদ্ব্যতীত নির্বোধ দুশমন জানে না যে, যদিও আযাবের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না, উহা কেবল তওবা ও ইস্তেগফারের দরুন টলিতে পারে, এতদ্‌সত্ত্বেও আথম, আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অর্থাৎ এই কথা লেখা হইয়াছিল যে, এই শর্তে বিপদ আসিবে যদি তাহারা ঔদ্ধত্যে কায়েম থাকে এবং প্রত্যাবর্তন না করে। অতএব আথম তাহার নির্বাক থাকা, কসম না খাওয়া, নালিশ না করা, এবং ইসলামের কোন সমলোচনা না করার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিল যে, সে ঔদ্ধত্যের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সে ষাট বা সত্তর জন মানুষের সম্মুখে ঠিক মুবাহালার (বিতর্কের) সময় জিহ্বা বাহির করিয়া এবং দুই হাতে কান ধরিয়া তাহার প্রত্যাবর্তনের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ঐ সময়ে কেবল মুসলমানেরাই উপস্থিত ছিল না; বরং প্রায় অর্ধেক লোক খৃষ্টান ছিল। নির্ভরযোগ্য সাক্ষীগণের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, সে ১৫ (পনর) মাস পর্যন্ত কাঁদিতেছিল। এরপরও কি তাহার প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত হয় নাই?

আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনা করা যথেষ্ট যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি শাখা ছিল। একটি শাখা ছিল আহমদ বেগ সম্পর্কে এবং অন্য শাখাটি ছিল তাহার জামাতা সম্পর্কে। অতএব আহমদ বেগ ও তাহার মৃত্যুর বেদনা তাহার আত্মীয়-স্বজনদের দম্ভ ও অহংকারকে চূর্ণ করিল এবং সে মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গেল। অপরজন ও অনবহিতরা কি করিয়া জানিবে যে, তাহার মৃত্যুর দরুন তাহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের উপর কি মুসিবত ও বিপর্যয় আসিল, এবং এই মুসিবত তাহাদিগকে কি শিক্ষা দিল এবং কতখানি ব্যথা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। অবশেষে এই ফল হইল যে, মির্যা মাহমদ বেগ, যাহার গৃহে এই বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়াছিল এবং যে গোটা বংশের অভিভাবক ছিল, সে আমার বয়াতের সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এখন যদি এই সকল কথা শুনিয়াও আজে বাজে কথা হইতে বিরত না হয় তবে আমি ইহার কি প্রতিকার করিব। এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের ব্যক্তিদিগকে আমি কীরূপে বিশ্বাস করাইব, যাহারা লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়াছে। তাহাদের বিদ্বেষের ব্যাধির আমি কি চিকিৎসা করিতে পারি? খোদাই তাহাদের চিকিৎসা করুন। ক্রন্দন ও তওবার দ্বারা। কি আযাব টলে না? শীঘ্র তোমরা আমাকে দেখাও ইহা কাহার শিক্ষা। হে বন্ধুরা! তোমরা কেন এতখানি বেহায়া হইয়া গিয়াছ? তোমরাতো কলেমায় বিশ্বাসী। তোমাদের কিছুটা খোদার ভয় করা উচিত। বাবু সাহেবের এই ইলহাম যাহাতে সে আমার সম্পর্কে লেখে যে, ঐ ব্যক্তি কাফের

মরিবে এবং অভিসম্পাতের কুপ্রভাব তাহার দিকেই উল্টাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার শিরোভাগে ঐ ১৫২ পৃষ্ঠাতেই তাহার এই লেখা আছে, "এই রাত্রিতে মির্যা সাহেবের পরিসমাপ্তি এবং কর্তৃত্বাধীন গরীব মুসলমানদের সম্পর্কে এই ইলহাম হইয়াছে।"

এতদ্ব্যতীত "আসায়ে মূসা"-এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় ভূমিকাসহ তাহার এই ইলহাম লেখা আছে, এই অধমকে ইলহামের মাধ্যমে এই দোয়াও শিখানো হইয়াছে, আল্লাহুম্মাফতাহ্ বায়নানা ও বায়না কাওমিনা বিলহাক্কে ওয়া আনতা খায়রুল ফাতেহীন– ইহার অর্থ সে এই করিতেছে যে, আমার মধ্যে ও তাহার মধ্যে অর্থাৎ এই অধমের মধ্যে খোদাতাআলা ফয়সালা করিবেন। এখন যে ফয়সালা হইয়া গিয়াছে তাহা কাহারো নিকট গোপন নহে। অদ্ভুত ব্যাপার যে, তাহার সম্পূর্ণ পুস্তকটি এই সকল ইলহামেই পরিপূর্ণ যে, তাহার জীবদ্দশাতে আমার জীবন বিনাশ হইয়া যাইবে, আমার সমস্ত জামাত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, মুবাহালার কুপ্রভাব আমার উপর পড়িবে এবং সে মরিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার বিনাশ দেখিয়া নিবে। ইহা ছাড়া তাহার বন্ধুরা বলে যে, যখন সে প্লেগে আক্রান্ত হয় তখন তাহার নিকট এই ইলহাম হয় আর্ রাহীল অর্থাৎ এখন তুমি পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবে। কে আছে যে, এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধির সময় তাহার হৃদয় আর্ রাহীল বলে না? খোদ আরবী ভাষায় প্লেগের অর্থ মৃত্যু। পাঠকগণ, আপনারা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন। আমি কিছুই বলিব না। পূর্বে বাবু এলাহী বক্স এই সকল ইলহামের উপর জোর দিত যে, আমার আয়ু খুব লম্বা হইবে, সেভাবে দীর্ঘ আয়ু ও দীর্ঘ স্থিতি এর কথা তাহার ইলহামে লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর তাহার ইলহাম ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্লেগে আমার মৃত্যু না দেখিবে এবং সম্পূর্ণরূপে আমার ধ্বংস দেখিয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মরিবে না। অতঃপর তাহার ইলহাম ছিল যে, পৃথিবীতেও তাহার বড় বড় উন্নতি হইবে এবং বহু লোক তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে, সে বাগানের মালিক হইবে এবং তাহার মাধ্যমে ইসলামের অনেক উন্নতি হইবে। এইগুলি ছিল তাহার পূর্বেকার ইলহাম, যদ্দারা তাহার পুস্তক "আসায়ে মূসা" পরিপূর্ণ। অতঃপর সে যখন প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ শত শত লোকের মৃত্যু দেখিয়া এই ব্যাধির পরিণতি তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন বাবু সাহেবের নিকট আর্ রাহীল ইলহাম হইল, যাহা "আসায়ে মূসা" এর সকল ইলহামের উপর পানি ঢালিয়া দিল। কিন্তু যদি ইহাকে ইলহাম বলিয়া ধরিয়াও নেওয়া হয় তবে ইহা রহমতের ইলহাম নহে; বরং ইহা গযবের ইলহাম, যাহা দারুণ ব্যর্থতার সহিত সম্পৃক্ত। এতদ্ব্যতীত ইহা পূর্বেকার ইলহামসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং এইরূপ ইলহামের দরুন অবাক হওয়ার কিছু নাই। কেননা, অধিকাংশ লোক যখন কোন ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং বাঁচিয়া যাওয়ার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন এইরূপ ইলহাম হইয়া থাকে বা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই ইহাতে অংশীদার। অতএব এমতাবস্থায় ইলহামের এই অর্থ হইবে যে, হে এলাহী বক্স! তুমিতো তোমার আয়ু লম্বা বলিয়া ঘোষণা দিতেছিলে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদী পক্ষের বিনাশ চাহিতেছিলে ও স্বগোক্তিকে খোদার ইলহাম মনে করিয়া এই কথা বলিতে যে, আমার বিরুদ্ধবাদী আমার জীবদ্দশায় প্লেগে মরিবে। কিন্তু আমি তোমাকে আদেশ দিতেছি যে, তুমি এই দুনিয়া ছাড়। মোট কথা, এই ইলহামের সত্যতা সম্পর্কে বহস করার আমার কোন প্রয়োজন নাই। সম্ভব যে, এই ইলহাম হইয়া থাকিবে। ইহাতে গযবস্বরূপ এই সতর্কবাণী আছে যে, এখন এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়াই তোমার জন্য উত্তম। কেননা, তুমি সত্য গ্রহণ কর নাই।

এই সকল লোকের বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে আমি অবাক হই যে, এলাহী বক্সের প্রতি আর রাহীল এর ইলহাম আরোপ করিয়া তাহার সকল ইলহামের বারটা বাজাইয়া দিতেছে। তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, তাহার ঐ সকল ইলহাম কোথায় গেল যেগুলির উপর ভরসা করিয়া সে আমাকে কাফের ও দজ্জাল বলিত এবং তাহার নিজের নাম মূসা রাখিত।

আসল ব্যাপার এই যে, তাহার ঐ সকল ইলহাম তাহার অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা ও স্বগোক্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত ঐগুলি ছিল শয়তানী কুপ্ররোচনা। এইজন্য ঐগুলি পূর্ণ হইতে পারে নাই বরং ঐগুলি তাহার লাঞ্ছনা ও বেইজ্জতীর কারণ হইল। হ্যাঁ, সম্ভব যে আর্ রাহীল খোদাতাআলার পক্ষ হইতে ইলহাম। কেননা, ইহা সতর্ককরণস্বরূপ একটি বাক্য। এইরূপ ইলহামের দাবী যদি ফেরাওনও করিত তবে আমার অস্বীকারের কারণ থাকিত না। কেননা, ইহা প্রমাণিত বিষয় যে, এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ও মুশরেক, পুণ্যাত্মা ও পাপী, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী নির্বিশেষে শেষ সময়ে সকলেরই এইরূপ ইলহাম হইতে পারে। ইহার প্রতিই এই আয়াতে বলা হইতেছে– "এইরূপ কোন আহলে কিতাব নাই, যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বা হযরত ঈসার ওপর ঈমান আনিবে না" (সূরা আন্ নিসা- আয়াত ১৬০)। তফসীরসমূহে লেখা আছে যে, আহলে কিতাবদের নিকট এই ইলহাম ঐ সময়ে হইয়া থাকে যখন তাহারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অবস্থায় থাকে বা মৃত্যুর সময় খুব নিকটবর্তী হয়। এখন বলা বাহুল্য যে, তাহারা তখনই ঈমান আনে যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্র নিকট হইতে ইলহাম হয় যে, অমুক রসূল সত্য। কিন্তু এই ইলহামের দরুন তাহারা খোদার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। খোদার সুন্নত (বিধান) এইভাবেই জারী আছে যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে অধিকাংশ লোক কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা তাহাদের নিকট কোন ইলহাম হইয়া থাকে। ইহাতে কোন ধর্মের বিশেষত্ব নাই, না ইহাতে সালেহ্ ও নেক্কার হওয়ার শর্ত আছে।

এতদ্ব্যতীত বাবু এলাহী বক্স সাহেব তাহার পুস্তক "আসায়ে মূসা" -এর ১৮০ পৃষ্ঠায় লেখে যে, অধমের নিকট নৌকার কাণ্ডারী হওয়ার ইলহামও হয়। নৌকা তৈরীর আদেশও ইলহামের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অতঃপর ইলহাম হইল– বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বী লা-গফুরুর রহীম। অতঃপর ইলহাম হইল– ইন্নাল্লাযীনা যালামু ইন্নাহুম লা মুগরাকূন–সর্বশক্তিমান খোদার ফযল ও দয়ায় ইহা প্রকাশিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশা আছে[১]। এই ইলহামও অনেকবার হইয়াছে– সাউরীহুম আয়াতি ফালা তাসতা' জিলূন।

১. একদিকেতো বাবু এলাহী বক্স সাহেব লেখে যে, আমি আমার ইলহামসমূহকে নিশ্চিত মনে করি না। সম্ভব যে, এইগুলি শয়তানী ইলহাম। এতদ্সত্ত্বেও সে এইরূপ ইলহামের উপর দৃঢ় আশা রাখে। অবাক লাগে এইরূপ আশা লইয়া সে সীমালঙ্ঘন করিয়া পশুত্ব অবলম্বন করিল। অবাক লাগে অন্যদেরকে ডুবাইয়া দেয়ার জন্য তো ইহলাম হয়। কিন্তু যে নিজেই এই ইলহামের লক্ষ্যস্থল হইয়া গেল। বাবু সাহেবের এই ইলহামের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, শীঘ্রই আমি আমার নিদর্শন দেখাইব, আমার সহিত জলদী করিও না। অতএব আমি জানি এই ইলহাম বাবু সাহেবের মৃত্যুতে পূর্ণ হইয়া গিয়া থাকিবে। তাহার মৃত্যু তাহার জন্য নিদর্শন নহে, কিন্তু আমার জন্য নিদর্শন।

এই ইলহামের অর্থ এই যে, সেই কাপ্তারী, যে তীরে ভিড়িবে এবং তাহার নৌকার আরোহণকারীরা নাজাত পাইবে। অতঃপর সে আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলে, যে সকল লোক এই নৌকায় আরোহণ করে নাই (অর্থাৎ এই অধম) তাহারা যালেম তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। সে আর বলে, ইহাও কয়েকবার আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে যে, খোদা বলেন, আমি আমার নিদর্শন এই সকল বিরুদ্ধবাদীকে দেখাইব। তাহারা যেন আমার সঙ্গে জল্‌দী না করে।

এখন বাকিগণ চিন্তা করিতে পারেন যে, তাহার প্লেগে মৃত্যু এই সকল ইলহামকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে। কাপ্তারী কি এইরূপ লোকদিগকে বেলা যাইতে পারে যাহারা নিজেরাই ডুবিয়া যায়, যেক্ষেত্রে অন্যদের ডুবিয়া যাওয়ার ওয়াদা ছিল যাহারা বিরুদ্ধবাদী, অর্থাৎ এই অধমই? তাহা হইলে সে কীরূপ কাপ্তারী ছিল এবং কীরূপ ছিল তাহার নৌকা ও ইহা কোন্ ধরনের ইলহাম ছিল, যাহা উলটা তাহার জন্যই প্রযোজ্য হইয়া গেল?

এতদ্ব্যতীত বাবু সাহেব তাহার পুস্তকের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লেখে, যে খেদমত সম্পকে মির্যা সাহেব গর্ব ও অহংকার করেন উহার বৈশিষ্ট্য– কুল হাল উনাব্বিউকুম বিল আখসারীনা আ'মালা এ শেষ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম মিথ্যা ও ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সে ২০১ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে লেখে, মির্যা সাহেব, জল্‌দী করিবেন না। আমি দৃঢ়রূপে আশা রাখি ও পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি বলে আমার ন্যায় উদ্ধত ও অহংকারী অন্য কেহ নাই সে নিশ্চয় ব্যর্থ ও পরাভূত হইবে।

এখন পাঠকগণ ইহার উত্তর দিন যে, মুন্সী সাহেবের এই কথাতো আমার সম্পর্কে ছিল। কিন্তু খোদা কি তাহার কথানুযায়ী আমাকে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের অবস্থায় মৃত্যু দিলেন না কী বাবু এলাহী বক্‌স সাহেবকে? আমি ইহার চাইতে অধিক বলিতে চাহি না। কেননা এখন সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।[১]

এতদ্ব্যতীত ২০২ পৃষ্ঠায় মুন্সী এলাহী বক্‌স সাহেব লেখে, বালম প্রথমে বদদোয়া করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহার জাতি উপহার দিয়া তাহাকে ফেত্‌নায় ফেলিল। মোট কথা, তাহার ধ্বংসের ইহাই কারণ ছিল। অতঃপর যে ব্যক্তির অবস্থা বালমের অবস্থার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, যে অধিকার হরণ করে এবং মিথ্যা দাবী করে। এই কাহিনী এই ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয়। ইহাই তাহার বক্তৃতার সারাংশ। কিন্তু আফসোস, বাবু সাহেব এই দিকে মনোযোগ দিলেন না যে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ অনুসন্ধান ছাড়া আপত্তি উত্থাপন করে এবং এইরূপ ব্যক্তিকে যে খোদার নিকট নির্দোষ ও রেহাইপ্রাপ্ত (যে প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকার হরণ করে নাই এবং না কোন মিথ্যা দাবী করিয়াছে) কোন পরিপূর্ণ প্রমাণ ছাড়া তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাকে দজ্জাল সাব্যস্ত করে এবং তাহার সমর্থনে খোদার নিদর্শন যাহা বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছে উহারও পরোয়া করে না, এইরূপ ব্যক্তির জন্যও কোন শাস্তি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত কি না। কিন্তু এখন এই সকল কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ এখন বাবু সাহেব তাহার মুবাহালা ও অভিসম্পাতের পর এই মিথ্যা বলা ও কটু ভাষার পরিণতি দেখিয়া লইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বাবু সাহেবের আরও একটি ইলহাম আছে। ইহা তাহার পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তাহা এই যে, ইয়াঁকূলূনা ইল্লা কাযিবা ইত্তাবাআ হাওওয়াহূ ওয়া কানা আমরুহূ ফুরুতা অর্থাৎ যে দাবী এই ব্যক্তি করে ইহা তাহার মিথ্যা দাবী। সে তাহার প্রবৃত্তির ইচ্ছার পিছনে চলিতেছে। সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। এখন তাহার ধ্বংসের দিন আসিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ, নিজেরাই এই ইলহামের উত্তর বুঝিয়া নিবেন।

কিন্তু এখন বাবু সাহেব বলুন যে, খোদাতাআলা তাঁহার সনাতন সুন্নত অনুযায়ী মিথ্যাবাদীদের সহিত যে আচরণ করিয়া থাকেন তিনি কি আমার সহিত করিয়াছেন না কী বাবু সাহেবের সাথে করিয়াছেন? কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হওয়ার মিথ্যা দাবী করে সে ব্যর্থ হইয়া ধ্বংস হয়। অতএব ইহা কি সত্য নহে যে, বাবু সাহেবের এই পরিণতিই হইল?

এতদ্ব্যতীত বাবু সাহেব তাহার পুস্তকের ৩১৯ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই ইলহাম লেখে "ঐ ব্যক্তির উপর গযবের পর গযব অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাকে আমি পচা হাড়ের ন্যায় করিয়া দিব এবং ঐ তুলার ন্যায় করিয়া দিব যাহা ধূনা হয়"। পাঠকগণ আপনারা নিজেরাই এই ইলহাম সম্পর্কেও ভাবিয়া দেখুন ইহা কাহার ক্ষেত্রে সত্য হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ৪৩৭ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই ইলহাম আছে, "খোদা তাহাকে মারিবেন এবং অতঃপর কবরে নিক্ষেপ করিবেন"।

অতঃপর "আসায়ে মূসা" পুস্তকের ৪৪১ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে বাবু সাহেবের এই ইলহাম আছে– ইয়ামিযুল খাবীসু মিনাত্তায়্যিবি জাআলনাহু হুবাউ মানসূরা-সালামুন আলায়কুম কাতাবা আলা নাফসিহীর্ রহমাহ্। ইনশাল্লাহ নির্ধারিত সময়ে ইহা প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা খবীসকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবেন। অর্থাৎ এইরূপ কোন অলৌকিক কাণ্ড দেখাইবেন যে, প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। এই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ আমাকে) আমি বিক্ষিপ্ত ধুলাবালির ন্যায় করিয়া দিব, অর্থাৎ ধ্বংস করিয়া দিব। কিন্তু হে এলাহী বকস্ তোমার উপর শান্তি। তোমার জন্য খোদা রহমত লিখিয়াছেন। তুমি ধ্বংস হইতে বাঁচিবে[২]। এখন চিন্তাশীলগণ চিন্তা করুন, শেষ পরিণতি কি হইল? বাবু সাহেব যে ধ্বংসের ইলহামের কথা আমার সম্পর্কে বলিয়াছে উহা কি তাহার জন্য আসে নাই? (ক্রমশঃ)

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

১. কোন কোন নির্বোধ আমার উল্লেখ করিয়া বলে, যদি এলাহী বক্‌স ব্যর্থ হইয়া মরিয়া গিয়া থাকে তবে আপনার ইচ্ছা কীভাবে পূর্ণ হইয়া গেল? কিন্তু ভাবুন আমিতো এখন পর্যন্ত জীবিত আছি এবং আমার ইচ্ছা দিনের পর দিন পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বাবু সাহেবতো মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার মূসার লাঠি ভাঙ্গিয়া তাহারই উপর পড়িয়াছে।

২. সে খুব বাঁচিল। মরিলতো প্লেগে মরিল। বাবু সাহেবের বন্ধুরা! সত্য করিয়া বল, তোমাদের কি এই ইচ্ছাই ছিল যে, বাবু সাহেব আমার জীবদ্দশাতেই প্লেগে মরিয়া যাইবে, যাহার মৃত্যু ও ধ্বংসের অপেক্ষায় তাহারা অপেক্ষমান ছিল। তাহার শত শত ইলহাম যাহা আমার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ছিল, ঐগুলি দ্বারা আমার কী ক্ষতি হইল? এ কি ব্যাপার ঘটিল যে, তাহার ইলহাম সমূহের বজ্র তাহার উপরই পড়িয়া গেল। কেহ আছে কি, যে ইহার উত্তর দিবে?

জুমুআর খুতবা

খোদা-প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পন্থা

**[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ৬ মার্চ, ১৯৯৮ ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]**

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ জাসীয়ার ২১-২৩ তম আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন :

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢١﴾
اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢٢﴾
وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٣﴾

অতঃপর বলেন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে যে-সব বিষয়-বস্তু আমি বর্ণনা করছি সে-সব বিষয়ের সঙ্গে এ আয়াতগুলোর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিগত খুতবায় হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যে উদ্ধৃতিটি আমি উপস্থাপন করছিলাম উহার অবশিষ্টাংশ এবং তাঁর (আঃ) আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি এখন আপনাদের শোনাবো।

প্রথমোক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্তাআলা বলছেনঃ "হাযা বাসায়িরুলিন্নাসে"- এই কুরআন ও এতে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলিল-প্রমাণ (স্বরূপ) অর্থাৎ যদি তারা এ বিষয়গুলোকে তাকওয়ার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তাতে প্রত্যেক আঙ্গিকেই তারা অভিনব আলো লাভ করবে। "ওয়া হুদাঁও ওয়া রহ্মাতুল-লে-কওমিঁই-ইউকেনূন"-এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য (যারা এসব বিষয়ে এয়াকীন রাখে এবং কুরআন করীমকে এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে পাঠ করে যে, এর মাঝে সংরক্ষিত) ঐ সব বিষয়ই হেদায়াত ও রহমতের কারণ। "আম্ হাসেবাল্লাযীনাজ্তারাহুস্ সাইয়েয়াতে"- যারা নানা রকম মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে "আন নাজ্আলাহুম কাল্লাযীনা আমানু"-যে, আমরা তাদেরকে ঐ সব লোকের সমতুল্য করে দিব বা তাদের সাথে উহাদের মতই ব্যবহার করবো, যারা ঈমান এনেছে "ওয়া আমেলুস সালেহাতে"-এবং সৎকর্ম করেছে- "সাওয়ায়াম্মাহ্ইয়াহুম্ ওয়া মামাতুহুম" ফলে, মন্দকর্মে লিপ্ত লোকগুলোর জীবন ও মরণ এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জীবন ও মরণ সমান বা একই রকম হয়ে যাবে? -তা কখনও হতে পারে না। বরং যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের সাথে আল্লাহ্ এরূপ এক স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করবেন এবং সর্বদা তা অব্যাহত রাখবেন যে, ইহজীবনেই তাদেরকে মন্দ কর্মে লিপ্ত লোকদের থেকে পৃথক মর্যাদায় প্রতিপন্ন করে দেখাবেন এবং দেখিয়ে দিবেন যে, এরা তাঁর বান্দা এবং ওরা ভিন্ন। "সা'য়া মা ইয়াহ্কুমূন" - তারা কত মন্দ বিচার করছে যা স্বয়ং তাদেরই বিপক্ষে যায়. তাদের পক্ষে মন্দই বয়ে নিয়ে আসে এবং তাদের সব রকম সফলতা থেকে বঞ্চিত হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্র এ বাণীটিতে আরও বিষয়াবলী নিহিত আছে, যেমন-তাদের এই (মন্দ) ফয়সালার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় ও পার্থিব জগতে বিপর্যয় ও দাঙ্গা-ফাসাদের উদ্ভব হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে যেমন বিরূপ ঘটনাবলী ঘটে, তা তাদের এই অন্যায় ফয়সালার দরুনই ঘটে থাকে- সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণে তো আমি এখন যেতে পারি না। মোট কথা, প্রথমতঃ ইহা তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এর কারণে সারা জগদ্ব্যাপী ফাসাদ ও কলহের উৎপত্তি হয় সেদিকে এ বাক্যটিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

"ওয়া খলাফাল্লাহুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরযা বিল হাক্কে" অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা আকাশমালা ও পৃথিবীকে যেহেতু অনড়-অটল সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই সত্যের সঙ্গে মন্দ টিকতে পারে না। একসঙ্গে থাকতে পারে না। উভয়ের পরস্পর কোন জোড় বা মিল নেই। অতএব, কী করে সম্ভব যে, খোদাতাআলা পৃথিবী এবং আকাশমালাকে এরূপ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা তাতে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কোন ফ্যাসাদ খুঁজে পাও না, পক্ষান্তরে ধর্ম-জগতে খোদা কিনা পুণ্যবান ও পাপীদেরকে পরস্পর এরূপ মিশিয়ে দেন যেন উভয় একে অন্যেকে জড়িয়ে থাকতে পারে! অথচ হকের সঙ্গে বাতিল থাকতে পারে না এবং বাতিলের সাথে হক থাকতে পারে না। এ ঘোষণাটি পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়েরই স্বাভাবিক দাবী ও চাহিদা। "ওয়া লে-তুজ্যা কুল্লো নাফ্সিম বিমা কাসাবাত"- আর এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক আত্মাকে যেন তার প্রত্যেক কর্মের সেই প্রতিদান দেওয়া হয় যা সে নিজেই অর্জন করে থাকে। "ওয়া হুম লা ইউয্লামূন" - এবং তাদের উপর কোন অবিচার করা হবে না। কেন না, যুলুম ও অনাচার হক্ বা সত্যের সাথে একত্রে চলতে পারে না। ন্যায়বিচার প্রকৃতপক্ষে হক্ বা সত্যেরই ফসল বিশেষ। অতএব, কুরআন করীম এ আয়াতগুলোতে অনেক গভীর ও ব্যাপক বিষয়াবলী বর্ণনা করেছে। এর বিস্তারিত আলোচনায় আমি যেতে পারি না, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সবিস্তারে এসব বিষয়ের উপর যে আলোকপাত করেছেন তা জামাতের তরবীয়তের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "প্রত্যেকে যেন নিজের আরামের চে' নিজের ভাইয়ের আরামকে অগ্রাধিকার দেয়। তোমরা সবাই আল্লাহ্তাআলার সঙ্গে এক সত্যিকার সন্ধি স্থাপন করো এবং তাঁর আনুগত্যের আওতায় ফিরে আসো। আল্লাহ্তাআলার ক্রোধ-আযাব-গযব অবতীর্ণ হচ্ছে, তা থেকে নিরাপদ হবে তারাই যারা পুরোপুরি নিজেদের সমস্ত পাপ থেকে তওবা করে তাঁর দিকে এসে যায়।" সুতরাং এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা বিভিন্ন মন্দকর্মে লিপ্ত লোকদের সংস্পর্শকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে নিজেরা প্রত্যেক মন্দকাজ থেকে দূরে থাকে। তাদের সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, তোমরা যদি

ওরূপ হতে চাও তাহলে তোমাদের প্রথম ও প্রধান গুণ এই হতে হবে যে, তোমরা যেন নিজের আরামের উপর নিজের ভাইয়ের বা অপরের আরামকে অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে সত্যিকার সন্ধিস্থাপন কর। আল্লাহ্‌র সাথে যথার্থ সন্ধি স্থাপনের দাবী ও চাহিদা হচ্ছে নিজের আরামের উপর নিজের ভাইয়ের আরামকে অগ্রগণ্য করা। এমনিতে বাহ্যতঃ ঐ দু'টি কথার মাঝে পরস্পর মিল পরিদৃষ্ট হয় না এই বলে যে, তোমরা যদি উল্লেখিত শ্রেণীভুক্ত হতে চাও তাহলে অপরের আরামকে নিজের আরামের উপর অগ্রগণ্য কর। কিন্তু, যদি আল্লাহ্ তা চান যে, তোমরা সমগ্র বিশ্বের আরামকে নিজের আরামের উপর অগ্রাধিকার প্রদান কর, তাহলে নিজের ভাইয়ের থেকে এই সফরের সূচনা না ঘটলে বিশ্বের দিকে এর সূত্রপাত বা অভিযাত্রা হতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কালাম (কথা) অত্যন্ত গভীর, এবং এর ইরফান (-মূলতত্ত্ব)-কে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এরূপ ক্ষেত্রও রয়েছে, যেখানে দু'টি কথার মধ্যে দৃশ্যতঃ মিল ও সহযোগ পরিলক্ষিত হয় না। আর মানুষ এর সমাধান ব্যতিরেকে এমনি এমনি পার হয়ে সামনে এগিয়ে যায়, অথচ ওসবই হচ্ছে এরূপ স্থল, যেখানে গভীরে নেমেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইরফানকে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। সুতরাং এখানে বক্তব্যটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, **তোমাদেরকে তো আল্লাহ্‌র খাতিরে দুনিয়াতে এজন্য স্থাপন করা হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজের আরামকে বিসর্জন দাও এবং তাদের আরামকে অগ্রগণ্য কর।** সুতরাং লক্ষ্য করুন, আঁ হযরত (সাঃ)-এর হুবহু তদ্রূপ জীবনই ছিল। উল্লেখিত বাক্য দু'টি যদি আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবন-ধারার উপর প্রয়োগ করে দেখেন তাহলে সামান্য এতটুকুও গরমিল আপনারা দেখতে পাবেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যে-সব মর্তবা (ঐশী মর্যাদা) লাভের সৌভাগ্য ঘটে তাতে এই কেন্দ্রীয় তত্ত্বটিই নিহিত রয়েছে যে, **বান্দা যখন নিজের আরামকে পরিত্যাগ করে নিজের ভাইদের বা অপরাপরের আরামের দিকে খেয়াল রাখতে আরম্ভ করে, তখন খোদা অবশ্যই তাকে অতিপ্রিয় হিসেবে নিজের দিকে টেনে নেন।** এবং এর জন্য জরুরী নয় যে, এই সফর নবুওয়ত লাভের পরেই শুরু হয়। বরং সূচনা থেকেই সকল নবী-রসূল এই পথেই আজীবন সফর করেছেন এবং সব চে' বেশি এর অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত-পূর্ব জীবন, যখন তিনি যে নিজের আরামের উপর নিজের ভাইদের তথা অপরের আরামকে কতো অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, নিরন্তর দিতে থাকেন-এই অনন্য গুণটির দরুন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে বেছে নেন। কেননা, এ গুণটি আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষতঃ প্রিয় এবং দুনিয়ার ইসলাহ্ বা সংশোধনের পথে অগ্রযাত্রা ঐ গুণটি ব্যতিরেকে সম্ভব-ই নয়। এ গুণটি থেকে যে বঞ্চিত সে প্রকৃতপক্ষে নবুওয়ত এবং নবুওয়তের দাসত্ব (আনুগত্য) থেকে বঞ্চিত। কাজেই আপনাদের পক্ষে এইসব বিষয় উপলব্ধি করা অপরিহার্য, যাতে আপনারা "আল্লাযীনাজ্ তারাহুস্ সাইয়েয়াত" (যারা মন্দকর্মে লিপ্ত থাকে) তাদের থেকে পৃথক ঐ শ্রেণীর লোকে পরিণত হন, যারা "আল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমেলুস্ সালেহাত" ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। উভয় শ্রেণীর লোকদের সাথে একই রকম ব্যবহার কার্যকর করা হবে না। ওরূপ হওয়া সম্ভবই নয়। অতঃপর "সাওয়ায়াম মাহ্‌ইয়াহুম ওয়া মামাতুহুম"-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যদি তোমরা খোদাতাআলার আশ্রয়ে আসতে চাও তাহলে নিজেদের সকল গোনাহ্ থেকে তওবা ক'রে তাঁর হুযূরে উপস্থিত হও। যদি তদ্রূপ কর, তাহলে তোমরা হয়ে যাবে ঐ সকল লোক, যাদের মাঝে আল্লাহ ভরে দেবেন এরূপ গুণাবলী, যার দরুন তোমরা দুনিয়ার লোকদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় পরিদৃষ্ট হবে। কোনও আর বিস্তারিত তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হবে না। পার্থক্যটি প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টিকেই আকৃষ্ট করবে। অতঃপর এঁদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে এবং কী পার্থক্য পরিদৃষ্ট হবে সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্যত্র বলেন; "এবং এই ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি এমন হয় যে, শয়তান তার কাছেও ভিড়ে না।"

শয়তানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধে আমরা লিপ্ত রয়েছি, সে যুদ্ধ শয়তানের সঙ্গে এমন এক সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদাতাআলার আশ্রয়ে এসে যায়। যখন এসে যায়, তখন শয়তান তার কাছেও ভিড়ে না। কেননা, **আল্লাহ্‌র আশ্রয়স্থলগুলোতে শয়তানের কোনও প্রবেশাধিকার নেই।** তিনি (আঃ) বলেনঃ "সে-ও তো সেখানেই যায়, যেখানে সে এতটুকুও ঠাঁই নেওয়ার সুযোগ পায় পা রাখার স্থানটুকু যদি সে পেয়ে যায়, তাহলে তখনই শয়তান সেখানে এসে যায়।"

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বলেছেন– "পুরোপুরি সমস্ত গোনাহ্ থেকে তওবা কর"-এর অর্থই হচ্ছে যে, শয়তানের জন্য পা রাখার মত স্থানটুকুও থাকতে না দেওয়া। কেননা, যখন সে একবার পা রেখে দেয়, তখন তার অভিশপ্ত পা আবার তাকে উহার প্রভাব দেখাতে আরম্ভ করে– ওখানে সে আরও জায়গা (দখল) করে নেয়। যেমন, উট এবং আরব বেদুঈনের কাহিনী আমি আগেও আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি– আসলে এখানেও সে-একই অবস্থা ধারণ করে। কথিত আছে যে, এক আরব মরুবাসী তার তাবু টানিয়ে ভেতরে বসে ছিল। তীব্র শীতের রাত ছিল। এমতাবস্থায় তার উট ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বললো, 'আমাকে মাথাটা ভেতরে দেয়ার অনুমতি দাও। কেননা, বাইরে প্রচণ্ড শীত। তাতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না– তুমি আরাম করে শুয়ে থাক।' যখন মাথায় উষ্ণতা অনুভব করলো তখন সে বুঝতে পারলো শীতের মধ্যে উষ্ণতার যে কী মজা! তখন সে মাথাটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে তার গর্দানও ঢুকিয়ে দিল এই বলে যে, গর্দানও তো মাথার সঙ্গেই যুক্ত। কাজেই এটার উপর কেনই বা যুলুম করি। তাই সে বেদুঈনকে বললো, 'তুমি একদিকে সরে যাও।' তারপর, তার শরীরের বাকী অংশ যেহেতু খুবই শীত অনুভব করছিল, এবং একটা অংশ গরম বোধ করছিল, তাই সে আরও এগুলো এবং সামনের পা দু'টিও ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, আমার সামনের পা দু'টো কী দোষ করেছে? এ দু'টোরও কিছু আরাম হতে দাও।' বেদঈন বেচারা জড়সড়ো হয়ে এক কোণায় ভিড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে উট বললো, 'তুমি একটু বাইরে যাও। কেননা, আমার দেহের পেছন অংশেরও অধিকার রয়েছে।" সুতরাং পাপগুলো ক্রমে ক্রমে স্থান করে নেয়। **যখন মানুষ একবার পাপকে ভেতরে আসার সুযোগ দিয়ে দেয়, তখন উহা আর তাকে ছাড়ে না। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কলা-কৌশল।** সুতরাং সেসব লোকই যখনই কোন পাপে লিপ্ত হয় তাদের প্রত্যেকেই তখনকার তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে যে, সব সময় সূচনাকালে সে ভাবে, এই সামান্য এতটুকু করে নেওয়াতে কী বা দোষ আছে? আর ঐ সামান্যটুকুই একবার যখন সে করে বসে, তখন ওটার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ তার জন্য অপরিহার্যতায় পরিণত হয়।

জগদ্ব্যাপী সমস্ত ড্রাগ এডিকশন এই মূল-ধারাতেই অব্যাহত রয়েছে। কলেজের ছাত্রদেরকে দুষ্ট লোকেরা প্রথমে বলে থাকে, "অল্প একটু মজা চেখে নাও, মাত্র এইটুকু।" ঐ অল্পটুকু যখন তারা চেখে নেয় তখন পরবর্তীটির আকাঙ্খা পূর্বের স্বাদ সৃষ্টি করে এবং উহা পাওয়ার আকাঙ্খা শুরু হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বক্তব্যটির এই হচ্ছে ফিলসফি। অতঃপর, তিনি বলেন :

"যখন খোদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তখন বরকত ও আশিস বর্ষিত হয় (-আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে অসাধারণ আশিস অবতীর্ণ করেন)। এই সব বিষয় (-এখানে তিনি আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে- ঐ সব পুণ্য এবং কামেল ঈমান লাভ হয়, তখন তওবা ইস্তেগ্‌ফারসহ এই দোয়াটি অধিকতর আবৃত্তি করো : "রব্বানা যলাম্‌না আনফুসানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্‌ফির্‌লানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লা-নাকূনান্না মিনাল খসেরীন'-এই দোয়াটি বার বার পাঠ করো।" প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, যার সূচনা হয়েছিল হযরত আদমের দ্বারা। আর যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরেকটি উদ্ধৃতি শোনাবো তদনুযায়ী উক্ত দোয়াটি সাধারণভাবে বিভিন্ন পাপে লিপ্ত প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। কেননা, সব রকম গোনাহ্ থেকে তওবা ক'রে খোদার কাছে হাযির হওয়ার যে কথা তিনি বলেছেন তা এই দোয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর শয়তানের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছে এ দোয়াটিই হচ্ছে উহার প্রতিকারস্বরূপ। ইহা সেই দোয়া, যা ঐ যুদ্ধের সূচনাকালে আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং আদম (আঃ)-কে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং **হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) শুধু পথের সন্ধানই দেন না, বরং সেই পথে পরিচালিত হবার জন্য এর সব রহস্য ও উপায়ের নির্দেশনা দান করেন। আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ের উল্লেখ তিনি বাকী রাখেন নি। একেই বলা হয় যুগ-ইমাম, যাঁকে খোদা নিজে তৈরী ও নিযুক্ত করেন এবং পদে-পদে নিজেই তাঁর পথ প্রদর্শন করেন।** সুতরাং এই দোয়ার দিকে ইঙ্গিত দানের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ "স্মরণ রাখ, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র আদেশে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে তাতে নিয়োজিত কর এবং তাঁর দীনের সাহায্য ও সমর্থনে যথাসাধ্য সচেষ্ট হও, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা সব বাধা দূর করে দিবেন। তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে। তোমরা কি দেখ নি যে, কৃষক উত্তম চারাগাছগুলো রক্ষার্থে তার ক্ষেত থেকে দেখে দেখে সব আগাছা ও অকেজো বস্তুগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয়।" উদ্ধৃতিটির পরবর্তী অংশটুকু আপাততঃ কাগজগুলোতে খুঁজে পাচ্ছি না, ভুলবশতঃ অন্য কোথাও রেখে এসেছি। তবে উহার যে বিষয়-বস্তু রয়েছে তা আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনা আদমের সময় থেকে ঘটে এবং তিনি উক্ত দোয়ার মাধ্যমেই শয়তানের উপরে বিজয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এবং এই দোয়া স্বয়ং আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং আজও প্রত্যেক ব্যক্তিকে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধের বেলায় এই দোয়ার আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই দোয়া অন্তরের গভীর আবেগের সাথে পাঠ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার তার সৌভাগ্য ঘটবে না। উক্ত ঐশী-সাহায্য পাওয়ার মাধ্যমেই অবশেষে তাকে শয়তানের উপর বিজয়লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত করা হবে। উদ্ধৃতিটির এই অংশটুকু আমি মৌখিকভাবে আপনাদের জানালাম।

এরপর, পূর্বে উল্লেখকৃত উদ্ধৃতিটিতে বর্ণিত এ বাক্যটির দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে আত্মনিয়োজিত হও এবং তাঁর দীনের সাহায্য-সমর্থনে সচেষ্ট হও'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দীনের সাহায্য-সমর্থনে সচেষ্ট হওয়া কারও ক্ষেত্রে প্রারম্ভেই সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হওয়ার দাবি রাখে না, বরং উহা সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হবার উপায় বটে। অতএব, যে ব্যক্তিই তার অন্তরে দীনের সাহায্য-সমর্থনের জন্য উদ্দীপনা অনুভব করে, তা সে যেমন অবস্থায়ই হোক না কেন, -কী কী পাপে সে লিপ্ত কী কী দুর্বলতা তার মধ্যে বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও সে যদি ঐ পবিত্র উদ্দীপনাকেই প্রাধান্য দেয় এবং এমনটি ভাবতে আরম্ভ না করে যে, সে কোথায়, আর দীনের সাহায্যে ব্রতী হওয়া কোথায়। বরং যা-কিছু-ই তার আছে, তা নিয়েই যেন সে ধর্ম সেবায় ব্রতী হয়।

"সুপার্দম্ তু মায়ায়ে খীশ্ রা
তুদানে হিসাবে কম্ ও বীশ্ রা।"

অর্থাৎ এই বলে যে, "হে আমার প্রভু! যে পুঁজি-ই আমার ছিল তা তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। এখন কম না বেশী সে-হিসাব তুমি-ই জান। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল তা পেশ করেছি।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, ওরূপ লোকদের আল্লাহ্ অবশ্যি সাহায্য করে থাকেন। তিনি (আঃ) বলেছেনঃ 'স্মরণ রাখো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র আদেশে সাড়া দিয়ে তাতে ব্যাপৃত হও- তাঁর দীনের সাহায্য-সমর্থনে সাধ্যমত সচেষ্ট হও'-এ সম্পর্কিত বিষয়-বস্তুটিই আমি আপনাদের কাছে এই মাত্র বর্ণনা করলাম। তারপর বলছেনঃ 'তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা সমস্ত বাধা দূর করে দিবেন'- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হবার পথে যে-সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই নফ্‌সের সৃষ্টিকৃত হয়ে থাকে, তা সবই আল্লাহ্ দূর করে দিবেন। 'তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে।' ওরূপ কেন হয়? "এজন্য যে, এমতাবস্থায় তোমরা খোদার চারাগাছস্বরূপ হয়ে যাও। যখনই তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে খোদার খাতিরে নিজেদের খিদমত পেশ কর, তখন তোমরা 'শাজারা তৈয়্যেবা' (-পবিত্রবৃক্ষ)-স্বরূপ হওয়ার উপযোগী হয়ে পড়। তোমাদের চারদিকে কাঁটাযুক্ত যে-সব ঝাড়-ঝোপ হয়ে রয়েছে, তা তোমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, অর্থাৎ খোদার দিকে তোমাদের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভের উপযুক্ততার পথে সেগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তখন আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের সাথে এই আচরণ করেন যে, তিনি ঐ সব বাধা দূর করে দেন। তোমরা কি দেখ নি যে, কৃষক উত্তম চারাগাছগুলো রক্ষার্থে তার ক্ষেত থেকে দেখে দেখে সব আগাছা ও অকেজো জিনিসগুলাকে উপড়ে ফেলে দেয়।" লক্ষ্য করুন, কতো স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা এখন ঐ সব চারাগাছে পরিণত হয়েছ তাদের হিফাযত আল্লাহ্ করবেন। এখন তোমাদের খাতিরে খারাপ গাছগুলোকে উপড়ে ফেলে দেবেন অর্থাৎ তোমাদের (নফ্‌সের) ভেতরে যে-সব বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী ঝাড়-ঝোপ উৎপন্ন হয়ে আছে- যা তোমাদের পুণ্যগুলোকে গ্রাস করছে-সেগুলোর রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে-এখন মালিকের কর্তব্য, সেগুলোকে বাগান থেকে উচ্ছেদ করা। তারপর তিনি আরও বলেন, "এবং (কৃষক) তার ক্ষেতকে নয়নাভিরাম ও ফলবান গাছে সুশোভিত করে তুলে (অর্থাৎ মানবাত্মায় উন্নতমানের পুণ্যের অতি মনোরম সদগুণাবলীর উন্মেষ ঘটতে আরম্ভ করবে)। মালিক তখন ওগুলোর হিফাযত্‌ও করে। প্রত্যেক প্রকারের

অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে তাদের রক্ষা করে।" এখন লক্ষ্য করুন, ক্ষুদ্র একটি কথা দিয়ে বিষয়টি শুরু করে তা কোথায় পৌঁছে দিলেন! এবং অভিযাত্রাকে সহজসাধ্য হিসেবে দেখালেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন করে বল্‌লেন, তাতে এবার তোমরা সফর আরম্ভ কর, এতে কোথাও কি কোন অসুবিধা আছে? অতএব, তোমাদের কাছে আপাততঃ যা কিছুই আছে তা আল্লাহ্‌র হুযূরে পেশ করে দাও। প্রেম ও বিনয়ের সাথে পেশ কর এবং নিবেদন জানাও যে, হে খোদা! এর বেশী আর কিছু আমাদের কাছে নেই, কিন্তু তোমার দীনের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যি আছে। সেই ভালোবাসার দরুন আমরা বাধ্য, উপস্থিত (আমাদের কাছে) যা আছে তা যেন পেশ করে দিই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "তারপর দেখো, খোদাতাআলা তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করেন! কিন্তু যে-সব বৃক্ষ ও চারাগাছ ফলবতী নয়, যেগুলো পচতে-গলতে ও শুকোতে আরম্ভ করে, মালিক সেগুলোর কোন তোয়াক্কা করেন না।" সুতরাং 'যেগুলো ফল আনয়ন করে না এবং পচতে ও শুকোতে আরম্ভ করে' –যখন কিনা ফল আল্লাহ্‌ই দান করে থাকেন এমতাবস্থায় এ দু'টি কথার মাঝে আপাতঃ যে বিরোধ দেখা যায় তা কী অর্থ বহন করে? এইমাত্র তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলে এসেছেন যে, ফল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়। কাজেই পচতে ও শুকোতে আরম্ভ করার ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা বা সংকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেজন্য তারা যদি নিজেদেরকে ইসলাহ্ ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ্‌র হুযূরে পেশ না করে– যে অবস্থায় আছে, সেখানেই যদি তারা অবস্থান করে এবং দীনের সেবা থেকে পিছপা হয়, তাহলে তারাই হচ্ছে ঐ সব বৃক্ষ ও চারাগাছ তুল্য, যারা পচবার ও শুকোবার জন্য সংকল্প পোষণ করেছে– তাদের সিদ্ধান্ত এটাই যে, তারা সুন্দর ও সজীব বৃক্ষের রূপ ধারণ করবে না। এমতাবস্থায় তারা আর মালিকের (কৃষকের) থাকে না, বরং কেটে পৃথক ফেলে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। 'পচতে-গলতে ও শুকাতে আরম্ভ করে'–কথাটি এ অর্থই বহন করে নচেৎ, ঐ সব পাপ ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও যারা মালিকের পরোয়া করে এবং নিজেদেরকে শুধরাবার চেষ্টা করে, মালিক অবশ্যই তাদের পরোয়া করে থাকেন। কিন্তু ঐ সব পাপ ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও যারা মালিকের পরোয়া করে না, মালিকও তাদের পরোয়া করবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বল্‌ছেন, "মালিক তাদের পরোয়া করবেন যদি কোন গবাদি পশু এসে তাদের খেয়ে ফেলে অথবা কোন কাঠুরে তাদের কেটে নিয়ে চুলোয় পুড়ে দেয়। অনুরূপ, তোমরাও স্মরণ রাখ যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র হুযূরে 'সাদেক' (সত্যবাদী) সাব্যস্ত হও, তাহলে কারও বিরোধিতা তোমাদের জন্য কষ্ট ও ক্ষতির কারণ হবে না।"

'সাদেক বা সত্যবাদী' বলতে সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতার সেই প্রারম্ভিক শর্তকেই বুঝায় যা আমি ব্যাখ্যা করে এসেছি। এর দ্বারা চূড়ান্ত শর্ত বুঝায় না, অর্থাৎ **যতক্ষণ তোমরা 'সিদ্দীক' না হও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পরোয়া করবেন না এমনটি নয়, বরং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের অন্তরের গভীরে যেন নিষ্ঠা ও সততা বিরাজ করে।** ওরূপ যদি হয়, "তাহলে কারও বিরোধিতা তোমাদের জন্য কষ্ট ও ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু **তোমরা যদি নিজেদের (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) অবস্থাবলীর সংশোধন না কর এবং আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে আনুগত্যের এক খাঁটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ না হও তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা কারও পরোয়া করেন না।** সহস্র সহস্র ছাগল-ভেড়া প্রতিদিন যবাই হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের প্রতি কেউ দয়া দেখায় না। যদি একজন মানুষ মারা যায় তাহলে কতো জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহি হয়ে থাকে!" এখন জগদ্ব্যাপী ওরূপই সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন ছাগল- ভেড়া যবাই হওয়াতে দয়া দেখাবার বিষয়-বস্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে তো অগণিত মানুষ ছাগল-ভেড়ার ন্যায় যবাই হচ্ছে, কিন্তু সেজন্য কারও কোনো পরোয়া নেই। যে অবস্থার কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করছেন তা সেই সময়কার কথা, যখন মানুষের মাঝে কিছুটা পুণ্য ও সদচেতনা মজুদ ছিল। কিন্তু এখন তো অপরাধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যেমন পানির মাত্রা মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়। অতএব, এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, **আপনারা যদি গোড়াতেই আপনাদের পুণ্যগুলোর হিফাযতের দিকে মনোযোগ না দেন, এবং পাপাচারের প্রতি উদাসীন থাকেন তাহলে এমনি ধারায় পাপের বন্যা বাড়তে বাড়তে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।**

এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলার এ জন্য প্রয়োজন যে, দুনিয়ার (প্রকৃত) সংস্কার-কার্যের দায়িত্বভার (আল্লাহ্ কর্তৃক) আমাদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। এখন দুনিয়ার যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা তার চেয়ে অনেক মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই কথাগুলো বলেছিলেন। বরং এখন এমন তো হয় যে, মানুষ একটা ভেড়া যবাই করার ব্যাপারে চিন্তান্বিত হয় – প্রশ্ন তোলা হয়, এটা একটি ভালো ভেড়া ছিল, কেন এটাকে যবাই করা হলো? কিন্তু মানব-নিধনের ব্যাপারে কোন মাথা-ব্যথা নেই। বিশ্বব্যাপী লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ অন্যায়ভাবে বধ করা হচ্ছে, কিন্তু এ জন্য মানুষের কোনো পরোয়া নেই। তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা কী ক'রে ঐ সব লোকের পরোয়া করবেন যারা তাঁর বান্দাদের কোনো পরোয়া করে না?! কাজেই, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এ সব মানুষের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের বিষয়-বস্তুটি আপনাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আপনারা যদি আরামের সাথে (নির্লিপ্ত) জীবন যাপন করতে থাকেন এবং নিজেদের চারদিকে তাকিয়ে উপলব্ধি না করেন যে, খোদার বান্দাদের উপর কী কী যুলুম-অত্যাচার হয়ে চলেছে, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে সকল সুসংবাদ জানিয়েছেন সেগুলো আপনাদের ভাগ্যে জুটবে না। তাই আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, উক্ত বিষয়-বস্তুটি যেন অবশ্যি অনুধাবন করি। কেননা, আমাদের ব্যতীত আর কেউ নেই যারা এই দুনিয়ার তক্‌দীর বদলাবে। যদি আমরা অনুধাবন না করি তাহলে আর কে করবে? অতএব, **আপনারা এই urgency (-জরুরী প্রয়োজনীয়তাটি) –যা আমি স্পষ্টতঃ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তা উপলব্ধি ক'রে খোদাতাআলার খিদমতে উপস্থিত হোন এবং এই নিবেদন করুন যে, হে খোদা! এই ব্যাপারটি তো আমাদের নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। প্রথমতঃ আমরা দুর্বল–সেই সামর্থ্য আমাদের নেই যাতে দুনিয়ার এহেন সংস্কার সাধন করতে পারি। তোমার বিগত নবী-রসূল ও প্রিয় বান্দাদের মাঝে তুমি ওরূপ সদ্‌গুণাবলী নিহিত করেছিলে, যার ফলে তারা দুনিয়ার দুরবস্থার জন্য সচেতনও ছিলেন এবং ওসব দুর্বলতা নিরসনের যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন। আমাদের অবস্থা তো এরূপ যে, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূরীকরণের আমাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই। সদাসর্বদা চেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনা করতে থাকা সত্ত্বেও সেই প্রথম দিনের মত অবস্থাতেই আমরা নিজেদের দেখতে পাই। অন্তঃকরণেরও পরিবর্তন ঘটে না, পারিপার্শ্বিকতারও পরিবর্তন**

ঘটে না। নিজেদের পরিবার-পরিজনদের সাথে আমাদের আচরণও বদলায় না। তেমনি অপরাপরদের সাথেও বদলায় না। কোন্ বিপদেই না আমরা আটকা পড়লাম?! উপরন্তু, যাদের সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত ছিল তারা খারাপের চেয়েও খারাপ হয়ে চলেছে। কাজেই, আমাদের সমস্যা বাড়ছে। এই অনুভূতিটি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। (অতঃপর) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ "কাজেই, তোমরা যদি নিজেদেরকে হিংস্র জীব-জন্তুর ন্যায় নিঃস্পৃহ-নির্লিপ্ত ও উদাসীনে পরিণত কর" (– যেমন হিংস্র জন্তুদের মধ্যে কোন মায়া-দয়া নেই, যদিও তাদের আশে-পাশে অন্যান্য জীব-জন্তুদের উপর যুলুম-নির্যাতন হতে থাকে না কেন .....'হিংস্রজন্তু' শব্দটির প্রয়োগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেছেন, আমি করিনি। সুতরাং আমি যে বিষয়টি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি, তদনুযায়ী চারপাশে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে কোন অনুভূতি না থাকা এটা এক ভয়াবহ হিংস্রতা বৈ আর কিছু নয়। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, ইহা হিংস্রজন্তুর স্বভাব। "যদি তোমরা নিজেদের হিংস্রজন্তুদের স্বভাব হতে দাও, তা হলে তোমাদেরও অনুরূপ অবস্থাই হবে। তোমাদের উচিত তোমরা যেন খোদাতাআলার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।" তাঁর প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হবার যে পন্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সে পথে যাত্রা অবলম্বন করা আবশ্যকীয়।" যাতে কোন মহামারী বা অন্য কোন বিপদ-আপদের পক্ষে তোমাদের স্পর্শ করার সাহস পর্যন্ত জন্মাতে না পারে।– আপদ-বিপদ ও মহামারী থেকে অনুরূপ নিরাপদ থাকা–ইহা এরূপ এক বিষয়-বস্তু যা জামাতের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের জীবনের ঘটনা ও অবস্থাবলীর উপর পর্যবেক্ষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আমি দেখেছি, খোদার এরূপ বান্দা যারা তাঁর দীনের সেবায় রাতদিন আত্মমগ্ন থাকেন তাদেরকে ঐ সব বিপদ-আপদ স্পর্শ করে না যা তাদের পার্শ্ববর্তীদেরকে স্পর্শ করে থাকে। তাঁরা এই পথে কোন পরোয়া করেন নি, তাদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের উপর কী দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে। ধর্মীয় প্রয়োজনগুলোকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা তাদেরকেও শামলিয়েছেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকেও। এরূপ ঘটনাবলীও আপনাদের দৃষ্টিগোচর থাকতে পারে যে, তারা যেন সংরক্ষিত হয় নি, বিপদাবলী তাদের উপর আপতিত হয়েছে। কিন্তু অন্তরের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্তাআলাই জানেন। কেন বিপদাবলী আপতিত হ'ল – এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্র রয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, যারা খোদাতাআলার জন্য নিজেদের দুনিয়াকে– সাংসারিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয় এবং তাঁর জগতকে গ্রহণ ও বরণ করে নেয়, আল্লাহ্তাআলা তাদের দুনিয়াকে হিফাযত করেন। তবে প্রকৃতির নিয়মের ধারায় কিছু কিছু যে দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করে তা তো সুস্থ চারা-গাছগুলোকেও স্পর্শ করে থাকে। কোন সময় ঝড়-তুফান প্রবাহিত হয়, বহু ধরনের বন্যা এসে যায় তাতে দুনিয়াতে সুস্থ-সবল বৃক্ষগুলোও প্রভাবিত হয়। কৃষক সে-গুলোকে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা যতটা ইচ্ছা করেন ততটা রক্ষা করতে পারেন এবং করে থাকেন। কিন্তু স্বল্পপরিমাণ স্বাদ আস্বাদনের জন্য কিছু কিছু ক্ষতি বা কষ্ট হতে দেন। এই বিষয়-বস্তুটি এরূপ, যা কুরআন করীম সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। সুতরাং আমি এ কথা বলি না যে, আপনারা যদি দীনের সেবায় আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়েন তাহলে দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি আপনাদেরকে স্পর্শ করবে না। যদি আপনারা এই ধারণা নিয়ে দীনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন যে, দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি (বা বাধা-বিপত্তি) যেন আপতিত না হয় তাহলে অবশ্যই স্পর্শ করবে। এই তত্ত্বটি আপনাদের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। অনুরূপ অবস্থা চিন্তা করে তৎপ্রেক্ষিতে দর কষে যদি আপনি এগোন এই বলে যে, **আপনার দেহকে এবং আপনার সন্তানদের দেহেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আপনার জন্য এক মাত্র পথ এটাই যে, এই নিয়্যত নিয়ে দীনের সেবার পথ বেছে নিচ্ছেন, তাহলে এই নিয়্যত বা ইচ্ছা আপনার কাজে লাগবে না। কিন্তু যদি দীনের সেবায় এমতাবস্থায় আত্মনিয়োজিত হন যে, স্ত্রী ও সন্তানদের কোন হিফাযতকারী বা রক্ষক আর থাকলো না বলে জানেন, তখন আল্লাহ্ তাদের হিফাযত করবেন।** অতএব, এই যাবতীয় অবস্থাবলী রয়েছে যা একটির সাথে আরেকটি জড়ানো রয়েছে। সেগুলোর দিকে বান্দাদের দৃষ্টি বা লক্ষ্য থাকে না এবং অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থাবলী মানুষ অবহিত থাকে না তৎপরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই বাণী নির্ঘাৎ সত্য, এবং তা আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে সত্য সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ঐ সব স্তরের মধ্যে দিয়ে আমাদের অতিক্রম করতে হবে, যে-সব স্তরের উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সবিস্তারে করেছেন। তিনি (আঃ) বলেনঃ "তোমাদের উচিত যাতে কোন মহামারী বা অন্য কোনও বিপদ-আপদের পক্ষে সাহস না জন্মাতে পারে তোমাদের উপর আক্রমণ করার।" লক্ষ করুন, কত শক্তিশালী ও মহান এই বাণী! –"সাহস না করতে পারে। কেননা, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে ভূ-পৃষ্ঠে কোন ঘটনা ঘটতে পারে না– আল্লাহ্র ঐ বিশেষ সাহায্য-ব্যবস্থার আওতায় আসার জন্য তাঁর উক্ত অমোঘ নিয়মের কথা তোমাদের অন্তরে বিরাজমান হওয়া উচিত এবং তোমাদের চলা-ফিরায় দৃশ্যতঃ পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।" অতঃপর তিনি বলেন, "সব রকম অস্থিরতা উত্তেজনা ও বিদ্বেষ এবং শত্রুতা নিজেদের মাঝ থেকে উঠিয়ে দিন (দূর করে দিন)।" এখন এই যে বিষয়টি রয়েছে এটাও এক অতি গম্ভীর বিষয়। কেননা, অধিকাংশ **যারা নিজেদেরকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রাখে এবং অস্থিরতা, উত্তেজনা ও বিদ্বেষ এবং শত্রুতাকে নিজেদের ভেতর থেকে তুলে দেয়ার সামর্থ্য রাখে না অথবা এ লক্ষ্যে চেষ্টা-প্রয়াস চালায় না, তারা খোদাতাআলার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।** তিনি বলছেন, "এখন এরূপ একটি সময়, যখন তোমরা যেন এই সব হীন ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে উপেক্ষা ক'রে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কার্যাবলীতে মশগুল ও তৎপর হয়ে পড়।" সুতরাং আমি বার বার আপনাদেরকে বুঝাই এবং বুঝাতে থাকবো যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোকে অবলম্বন করা আপনাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। এতদ্ব্যতিরেকে আমরা আল্লাহ্তাআলার নিরাপত্তার ছায়াতলে আসতে পারি না। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়াতলে আসা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। তবে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। বরং যখন বাহ্যতঃ কোনও নিরাপত্তার ছায়া পরিদৃষ্ট হয় না, **বীরপুরুষ সেই ব্যক্তি যে তখন অগ্রসর হয়ে নিজেকে সেখানে সমর্পণ করে এবং যা কিছুই তার উপর দিয়ে যায় সেজন্য সে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। কেননা, দীনের প্রতি আসক্তি এবং দীনের সেবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা তার হৃদয় থেকে এতো প্রবল বেগে উত্থিত হয় যে, উহার দরুন সে আত্মবিহ্বল হয়ে পড়ে।** এই আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা যদি আপনাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় তাহলে আপনারা তারাই, যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখনও ঐ আকাঙ্ক্ষা সেরূপ জোরে উত্থিত হয় নি, যেরূপ একটি অগ্নিশিখা – যা ক্রমে ক্রমে আগুন ধরিয়ে দেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কথা এমনই, যা

শ্রবণ ক'রে আপনারা অনুধাবন তো করতে পারেন, কিন্তু উপকৃত হতে পারেন না। সেজন্য সময় আছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের অন্তরে ডুব দিয়ে এইরূপে চিন্তা করে, তাতে সবিস্তারে অনুসন্ধান করে যে তার অন্তরের কোনও অংশও অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী, তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, তার মুখ দিয়ে হক্ ও মা'রেফতের জ্ঞানতত্ত্ব নিঃসৃত হয়।" হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সত্য ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়বলী বর্ণনা করেছেন, সেই সঙ্গে এই সুসংবাদও দিয়েছেন যে, তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনেকে এরূপ হবেন, যাদেরকে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় এরূপ বুঝানো হবে যে, তারা দুনিয়ার বড় বড় আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করে দেবে। অনেকে আমার কাছে এই মর্মে দোয়া করার জন্য পত্র লিখেন। কীরূপে দোয়া করবো? যখন কিনা সেই পথ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ দেখিয়েছেন তা তারা অবলম্বন করছেন না। তারা মুখ স্থির করে রেখেছেন পূর্ব দিকে, আর আমার কাছে তাঁরা এই দোয়া চান যেন আমি তাদেরকে পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছিয়ে দেই। **অভিমুখ যে-দিকে হবে, তারা তো সে-দিকেই যাবে। কাজেই অভিমুখ সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে।** তিনি (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নফ্সানী জোশের অধীনে চলে (-প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে অনুসরণ করে), তার পক্ষে সম্ভবই নয় যে, তার মুখ দিয়ে হিকমত ও মা'রেফতের কথা নিঃসৃত হয়- ঐ সব সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়াবলী, যদ্দরুন সে বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী লোকদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে, তা সুদূর পরাহত। প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী থাকা সত্ত্বেও তাদের এই আকাঙ্খা যে, তারা যেন অতি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন- তা কখনও হতেই পারে না। কেননা, তারা এটাই জানেন না যে, মহান ব্যক্তি হবার আকাঙ্খাই তাদের অভ্যন্তরকে উলঙ্গ করে। ডঃ আব্দুস সালাম এই আকাঙ্খা নিয়ে জীবনযাত্রা পথে পাড়ি দেন নি যে, তিনি যেন মহান ব্যক্তি হয়ে যান। বরং যখন মহান ব্যক্তিতে পরিণত হন, তখন সর্বদা বিনয়ের দিকেই ঝুঁকে থাকেন এবং সদা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তিনি নিজ সত্তায় কিছুই নন। তাঁর (জীবনের) কাহিনী (রহস্য) ছিল এই যে, তিনি তাঁর বুযুর্গ ও খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত পিতার দোয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ঐ সমস্ত দোয়াতেই নির্ভর করে তিনি সম্মুখে প্রত্যেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং কোথাও কখনও নিজেকে বড় মনে ক'রে উহাকে নিজের মাহাত্ম্য এবং স্বীয় সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্বের জন্য দায়ী বা উৎসস্বরূপ নির্ধারণ করেন নি। ইহা একটি ছোট উদাহরণ বটে। কিন্তু যারা দোয়ার জন্য পত্র লিখেন এই বলে যে, আল্লাহ্তাআলা যেন তাদেরকে 'সালাম' বানিয়ে দেন, তাদের কখনও এদিকে খেয়াল যায় নি যে, তাদের এই কামনাই তাদের নাফ্সানীয়তে'র (আত্মম্ভরিতার) দিকে ইঙ্গিত বহন করছে। কিসে পরিণত হোক তারা- এর সঙ্গে তাদের কী সংশ্রব? **প্রকৃতপক্ষে (তাদের) দোয়া এই হওয়া উচিত যে, খোদাতাআলা যেন তাদেরকে নিজের আপনজন করে নেন।** যখন আমরা খোদার হয়ে যাব, যখন "রব্বি ইন্নী লিমা আন্যালতা ইলাইয়া মিন খইরিন ফাকীর"(হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি অবতীর্ণ কর, আমি অবশ্যই উহার ভিখারী-) সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু শুরু হয়ে যায়। তোমাদের কোন্ কোন্ (স্বভাবজ) ক্ষমতাকে উদ্ভাসিত ও বিকশিত করা এবং সেগুলোর শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছান আবশ্যকীয়-তা তোমরা আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দাও। সে-ফয়সালা তিনিই করবেন। আল্লাহ্তাআলা যে সব চারাগাছের হিফাযত করেন, আর এজন্যই করে থাকেন যে, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিরেকে সেগুলো আপন প্রতিভা বিকাশে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ই অদৃশ্য হাতে তাদের রক্ষা করে থাকেন, তাদের জন্য এরূপ পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যাতে ঐ চারা গাছগুলো নিজেদের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার শেষ মাত্রায় উপনীত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "তার মুখ দিয়ে হিকমত ও মা'রেফাতের কথা নিঃসৃত হতে পারে তা কখনও সম্ভবই নয়। বরং তার প্রত্যেকটি কথা ফ্যাসাদের ডিম্বস্বরূপ হয়ে থাকে" -যার নফ্স (প্রবৃত্তি) তার উপর প্রবল হয়ে থাকে। তার সেই ডিমগুলি থেকে ফসাদের কীট নির্গত হয়। **সুতরাং যে তার বাসনা-কামনা ও প্রবৃত্তিমূলক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে থাকে, তার গৃহে এবং তার চার পাশে কেবল ফসাদ হতেই দেখতে পাবেন। তার সম্পর্কাবলীতে ফসাদ থাকবে।** সুতরাং কেবল কীটই বের হয় না, বরং বলছেন সেগুলো কীটে পরিপূর্ণ ডিম্বস্বরূপ হয়ে থাকে। যখন সেগুলো ফাটে তখন কীট চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। "যদি তোমরা রূহুল-কুদ্স- পবিত্রাত্মার শিক্ষার সাহায্যে কথা বলতে চাও, (-'ইরফান' উহাই যা রূহুল-কুদুসের দ্বারা লাভ হয়-,) তাহলে সমস্ত প্রকারের 'নফ্সানী জোশ' (প্রবৃত্তির উত্তেজনা) তোমরা তোমাদের ভেতর থেকে দূরীভূত কর।" অতএব, এগুলো হচ্ছে ঐসব স্তর যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিশদভাবে বার বার ব্যাখ্যা করে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরছেন। প্রথম স্তরই অতিক্রম করা হয়ে উঠে না ঐ সব লোকের পক্ষে, যারা ভ্রুক্ষেপই করে না যে, কে তারা। আত্মপরিচয় যার নেই, সে কী ক'রে গভীর জ্ঞানতত্ত্ব লাভ করবে? **দুনিয়াতে যত সব ঝগ্ড়া-বিবাদ তা এই গাফিলতি ও অবজ্ঞার দরুনই যে, মানুষ আত্মপরিচয় বিবর্জিত।** এবং বাহ্যতঃ ইরফানমূলক তত্ত্বজ্ঞানের সে অভিলাষীও, আবার অহংকার বশে কিছু কিছু ইরফানের কথাবার্তাও আওড়ায়, কিন্তু এ সবই অন্তঃসারশূন্য। এগুলো থেকে যেসব ডিম ফুটে, সেগুলো থেকে কেবল কীট নির্গত হয়, যা আবার আগপিছে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেয়। "অতএব, তোমরা যদি রূহুল-কুদুসের শিক্ষার সাহায্যে কথা বলতে চাও, তাহলে সমস্ত নফ্সানী জোশ ও নফ্সানী ক্রোধ-উত্তেজনা নিজেদের ভেতর থেকে দূরীভূত কর। তখন পবিত্র মা'রেফাতের রহস্য-ধারা তোমাদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হবে।" উক্ত বিষয়টি যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের বরাত দিয়ে লিপিবদ্ধ করেন নি, কিন্তু যে ধরনের রূহানী তত্ত্বজ্ঞানের ফল্গুধারা তার লিখা ও বাণীগুলো থেকে প্রস্ফুটিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, তার ক্ষেত্রে ঐসব কলুষতাপূর্ণ ডিম সৃষ্টিই হয় নি। আমাদের জন্য তো নির্দেশ এই যে, সে-গুলোকে নিজেদের ভেতর থেকে বের করে দাও, কিন্তু কতিপয় এরূপ মানবহৃদয়ও রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্র ফযলে ঐসব নোংরা ডিম সৃষ্টিই হয় না, যা কীটে ভরপুর হয়ে এঠে। তাঁদের মুখ দিয়ে যে বাণী নিঃসৃত হয় তা শয়তান কখনও স্পর্শ পর্যন্তও করে নি। তাঁদের যে সব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকে সেগুলোকে শয়তান কখনও স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সুতরাং **এই উন্নত ও সুউচ্চ অবস্থানটিকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করুন এবং সেদিকে অভিযাত্রা শুরু করুন এবং প্রতিনিয়তঃ আপনাদের জীবনকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকটবর্তী হতে থাকা উচিত।** আর যখন তিনি নিজের অবস্থান থেকে আমাদেরকে বা দুনিয়াকে অবলোকন করেন তখন যে-সব কথা আমাদের উদ্দেশে বর্ণনা করেন সেগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়। বহুবার অনেকে আমার কাছে উল্লেখ

করেছেন যে, "আমাদের শিক্ষা" পুস্তকটির একটি পৃষ্ঠাও অধ্যয়ন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অল্প একটু পাঠ করলেই মনে হতে আরম্ভ করে যে, তারা তো তাঁর জামাতভুক্তই নয়। তাদেরকে আমি সব সময় বুঝাই যে, তাদের সেই মাকাম ও অবস্থান নয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রয়েছে। অতএব, নিজেদের অবস্থানে থেকে ঐ বিষয়গুলোর দিকে অভিযাত্রা শুরু করুন। যখনই আপনারা যাত্রা শুরু করে দেবেন তখনই জামাতভুক্ত হয়ে পড়বেন। **এমনি ধারায় কোন নোংরা (দুর্বল) ব্যক্তিও যখন সফর শুরু করে তখন আল্লাহ্ তাকেও পরিশেষে তাঁর প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।** কাজেই এই বাক্যটিতে ভীত হবেন না এই বলে যে, অমুক আমার জামাতভুক্ত নয় এবং অমুক-অমুকও নয়। বরং এ বাক্যটি থেকে এ মর্মে ভীত হয়ে নিজেদের ভেতর জামাতভুক্ত হবার ঐ আকাঙ্খা সৃষ্টি করুন। আর যখন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করবেন, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত এবং তাঁর প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি বলেন, "তখন তোমরা আসমানে ভূপৃষ্ঠের এক ফায়দাজনক (মূল্যবান) বস্তু বলে বিবেচিত হবে এবং তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করা হবে।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহামারী ও বিপদাপদ স্পর্শ করে না বলে যে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা একটি বাস্তব সত্য এই বলে যে, ঐ সকল নেক ব্যক্তি, যারা খোদাতাআলার দীনের সেবায় আত্মমগ্ন ও তৎপর থাকেন, তাদের এবং তাদের পরিবার ও পরিজনদের আয়ু বাড়ানো হয় যাতে তাদের দ্বারা খোদাতাআলার দীন অধিকতর উপকৃত হতে পারে। তিনি আরও বলেন, "বিদ্রুপাত্মক কথা বলো না এবং ঠাট্টা-মস্কারি করো না। তোমাদের উচিত, তোমাদের কথা-বার্তায় যেন হীনমন্যতা ও অবজ্ঞাসূচক কোনও অংশও না থাকে।" গতরাতেই আমি আমার মেয়েদের বুঝাচ্ছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বলেছেন- "বিদ্রূপাত্মক কথা বলো না এবং ঠাট্টা-টিটকারী করো না"-এর দ্বারা সেই হাস্য-রসকে বুঝায় না, যা নির্মল হয়ে থাকে। ঠাট্টা ও **বিদ্রূপ অতি লাঞ্ছনাজনক বস্তু, যা মানুষের অন্তরে কেবল দুঃখ-বেদনার কারণ ঘটায় এবং নোংরামি ছড়াবার কারণ হয়।** এথেকে দূরে-দূরে যে সূক্ষ্ম ও নির্মল হাস্য-রস রয়েছে-আমি ঐ ধরনের কোন বাক্য তুলে ধরে তাদেরকে বুঝালাম এবং প্রমাণস্বরূপ পেশ করলাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এতো সূক্ষ্ম ও নির্মল হাস্য-রসের অধিকারী ছিলেন, যার পদধূলির কাছেও মানুষ ভিড়তে পারে না। তাদের হাস্য-রসের মাঝে থাকে নোংরামি ও হীনমন্যতা। এবং তাদের হাসি-ঠাট্টার দরুন মন-মানসিকতা ভারাক্রান্ত ও তমাসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাস্য-রস এতো সূক্ষ্ম ও নির্মল যে, মানুষ হতভম্ভ হয়ে পড়ে। এবং এই হাস্য-রসকে তিনি বিপক্ষের মোকাবেলায়ও ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বিপক্ষকে নীচু ক'রে দেখানো কখনও তার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইসলামকে সমুন্নত করে দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, কোন সময় হাস্য-রসের ক্ষেত্রে যে আপাতঃদৃষ্টে কাউকে নীচুও দেখানো হয় কিন্তু কখনও এর উদ্দেশ্য তাকে নীচু ক'রে দেখানো হয় না। উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই যে, সে যখন ইসলামের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না তখন তাকে দেখানো হয় যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ এবং তোমার সাধ্য নেই যে, তুমি ইসলামকে খাঁটো করে দেখাতে পার। সুতরাং (আর্যসামাজী পন্ডিত) মুরলিধরের সঙ্গে বিতর্কের বেলায় অনুরূপ অস্ত্র তিনি প্রয়োগ করেন। সে ক্ষেত্রে সব শেষে যে কথাটি তিনি প্রবাদ বাক্যস্বরূপ তুলে ধরেন তা ছিল এই যে, তিনি বলেন, "আপনার সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠানের পূর্বে আপনার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, আপনি হিক্‌মতের কথা-বার্তা হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং যা কিছু আমি উপস্থাপন করছি তা থেকে ইসলামের সৌন্দর্য আপনার মন-মস্তিষ্কে পথ করে নিবে। কিন্তু তা (আপনার পক্ষে) সম্ভব হলো না। এতো সময় নষ্ট হলো কিন্তু আপনার বোধগম্য কিছুই হলো না।" মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অতঃপর বললেন, "আপনার দৃষ্টান্ত তো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার গ্রামে অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এই বলে যে, সে অত্যন্ত জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তি। দূর দূর থেকে মানুষ তার দর্শনলাভের জন্য উপস্থিত হতো এবং তার কাছে মূল্যবান তোহ্‌ফা-উপঢৌকন পেশ করতো। আর সে সবসময় নীরবতায় তন্ময় হয়ে থাকতো। সে মনে-মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, সে নীরবই থাকবে। কেননা, মুখ খোলা মাত্র তার মুখ দিয়ে অবশ্যই কোন বোকামির কথা বেরিয়ে যাবে। তাই সে ঐ নীরবতা পালন করে অনেক মহৎ ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে গেলো। তার দর্শনার্থে দূর দূর থেকে মানুষ আসতে থাকে এবং উপহারে উপহারে তার ঘর ভরে যায়। অবশেষে একদিন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সে বলে উঠলো, 'হে আমার প্রিয়গণ! এতো দূর দূর থেকে তোমরা আস এবং এতো সম্মান তোমরা আমাকে দিচ্ছ। আমারও কর্তব্য বর্তায় যেন কিছু কথা বলি, কিছু উপদেশ দান করি।" সবাই তখন তার দিকে কায়োমনোবাক্যে মনোযোগী হলো। সে তার কথা ও উপদেশ শেষ করার আগেই সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেলো। একজনও থাকলো না। যারা তার চারপাশে তার প্রতি মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট ছিল তারাও তাকে পরিত্যাগ করলো। সে তখন পূর্বের ন্যায় একা থেকে গেল, বরং অধিকতর লাঞ্ছিত অবস্থায় পর্যবসিত হলো। উক্ত প্রবাদটি উপস্থাপন করার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বল্‌লেন, আমার যদি আগে জানা থাকতো যে, আপনি (মুরলিধর) মুখ খুললে ওরূপ কথাবার্তাই বলবেন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে কখনও বিতর্কে অবতীর্ণ হতাম না।" এ ক্ষেত্রে মূখ্য বিষয় (আসল রূহ) হচ্ছে ইসলাম ধর্ম; ঐ ব্যক্তিটিকে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সে যেহেতু ক্রমাগতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল বকেই যাচ্ছিল, সেজন্য দুনিয়াকে দেখাবার উদ্দেশ্যে যে, তার অবান্তর কথা-বার্তার মধ্যে সামান্যটুকুও গুরুত্ব নেই-সে একটা পাগল মাত্র, যার কথা শ্রবণ করারও উপযুক্ত নয়, এতদোপলক্ষ্যে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্মল হাস্য-রসের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় সাব্যস্ত করলেন। কেউ বলতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হাসি-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়েছেন- ওরূপ যদি কেউ মনে করে তাহলে অত্যন্ত বোকা সে-ব্যক্তি। সমস্ত ঐ সবক্ষেত্র, যেখানে তিনি হাস্য-রস প্রয়োগ করেছেন সেগুলো পরখ করে যদি দেখেন তাহলে আপনাদের মন-মস্তিষ্ক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হাস্য-রস একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের গুণ, এবং যে সূক্ষ্মতার সাথে সুন্দরভাবে তিনি এই হাস্য-রস ব্যবহার করেছেন, সে-দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যতম দক্ষ বৈহাসিকও তার কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারবে না। অতএব, "ঠাট্টা-মস্করা করো না" কথাটির এই অর্থ। এখন যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে সেহেতু উদ্ধৃতিগুলোর এই পাণ্ডুলিপি প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব শামলিয়ে রাখুন। আগামীতে এখান থেকেই শুনানো হবে।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও সরাসরি অনূদিত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
সদর মুরব্বী

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)
মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
(১৭তম কিস্তি)

তৃতীয় বিপ্লব–প্রত্যক্ষ ঐশী-বাণী লাভ

তৃতীয় বিপ্লব যা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে উহা এই যে, মূসা (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত ঐশী-বাণীর পদ্ধতিও পরিবির্তত হয়ে চলে আসছিলো এবং এখন প্রত্যক্ষভাবে ওহী ও ঐশী-বাণীর পদ্ধতি প্রচলিত হলো। কেননা, শরীয়তের খুঁটি-নাটির ব্যাপারে বিতর্ক হওয়ার ছিলো। আর এর জন্যে শাব্দিক ওহীর প্রয়োজন ছিলো যেন খোদার কথা সংরক্ষিত হয়, এ কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্তালা বলেন-কালামাল্লাহু মূসা তাকলিমা (সূরা নিসাঃ ১৬৫ আয়াত) অর্থাৎ মূসার কাছে বহু প্রত্যক্ষ ওহী হচ্ছিলো। এর অর্থ এই নয় যে, প্রথম থেকে প্রত্যক্ষ ওহী হতো না, বরং এর অর্থ এই যে, ইতোপূর্বে অধিক পরিমাণে স্বপ্ন ও কাশ্ফের ওপরে ব্যাপ্ত ছিলো এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহ্তালা স্বীয় নবীগণের নিকট অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে থাকতেন। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অধিকাংশ কথা প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযেল হয়েছিলো। আর অধিক পরিমাণ স্বপ্ন ও কাশ্ফের স্থান অধিক পরিমাণ শাব্দিক কথোপকথন দখল করে নিলো। কিন্তু তখনও অর্থকে সংরক্ষণ করাকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। যেভাবে আমরা যখন যায়েদের সাথে কথা বলি তখন ভাষা ব্যবহার করি যাতে এভাবে তার আমাদের কথা বুঝতে সহজসাধ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের কথাগুলোকে তাকে মুখস্ত করাই না বরং তার মনে যেভাবে গেঁথে যায় তদনুযায়ী সে কাজ করে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের কথাগুলো সম্বন্ধে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে চাই তাহলে পরে আমরা তা লিখিয়ে দিই। আর এ পার্থক্যই কুরআনী ওহী ও মূসাই ওহীর মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর যুগে তখনও এ আদেশ বলবৎ ছিলো না যে, যে কথাই শুনো উহাই লিখো। যে কথা বলা হতো তদনুযায়ী বিষয়-বস্তুর ভিত্তিতে কিতাবে লেখা হতো। কিন্তু কুরআনী ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে উহার যবর, উহার যের, উহার পেশ এবং উহার জযম পর্যন্ত ঐশী-বাণীর মাধ্যমে বলে দেয়া হতো।

ঈসা (আঃ)-এর যুগের বাণীঃ শরীয়তে মূসার পুনর্জীবনঃ

মূসা (আঃ)-এর যুগের পরে এখন ঈসা (আঃ)-এর যুগের আরম্ভ হয়। এবং ঈসা (আঃ)-এর যুগই ঐ প্রথম যুগ যখন কিনা ঐতিহাসিকভাবে ঐ আয়াতের দ্বিতীয় অংশের অধীনে চলে আসে অর্থাৎ মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখইরিম মিনহা আও মিসলিহা (সূরা বাকারাঃ ১০৭ আয়াত) অর্থাৎ আমাদের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত নির্দেশাদি যখন মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যায় তখন আমরা পুনর্বার ঐ নির্দেশাদি অবতরণ করি অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উহাকে জীবন দান করি। ঐ যুগে এমন একজন নবী এসেছেন যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। বরং তওরাতের কতক বিষয়-বস্তুকে ঐ যুগে সুস্পষ্টভাবে দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত করে দেখান। এজন্যে হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের প্রসঙ্গে আল্লাহ্তালা বলেনঃ আইইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস (সূরা বাকারাঃ ২৫৪ আয়াত) অর্থাৎ আমরা তাকে পবিত্রাত্মা দ্বারা সাহায্য করেছিলাম-অনুবাদক) মূসায়ী যুগে শরীয়তের পূর্ণতা হয়েছে আর উহার তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল বিধানের রূপ লাভ করে যার কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে ছিলো না। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকদের দৃষ্টি শাস থেকে সরে গিয়ে খোশার প্রতি পড়লো। এবং অন্যদিকে মানবীয় বোধি তখন ঐ মান পর্যন্ত উন্নতি করেছিলো যে, উহাকে সূফী-তত্ত্বের ব্যাপারে আরও শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যকীয় ছিলো। অতএব ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হলেন যেন এক দিকে তওরাতের নির্দেশাবলীকে পূর্ণ করেন যেভাবে তিনি স্বয়ং বলেছেন, মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি-১৭ঃ৫)। এবং অন্য দিকে তিনি লোকদেরকে তওরাতের প্রজ্ঞা শিখান আর তাদের দৃষ্টি খোশা থেকে সরিয়ে শাসের দিকে পরিবর্তন করেন। তিনি বলেছেন যে, বাহ্যিক শরীয়ত কেবল এ দুনিয়ার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে আর গোপন শরীয়তের নির্দেশাবলীতে সহায়তা প্রদান করার জন্যে– নচেৎ আসল বিষয় হোল কেবল অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা-নির্মলতা ও পবিত্রতা। সুতরাং আল্লাহ্তালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করালেন। তিনি মূসায়ী নির্দেশাবলীকে দ্বিতীয়বার আসল আকারে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং অন্য দিকে যেসব লোক খোশা বা বাহ্যিকতার পূজারী ছিলো তাদেরকে বললেন. যে, এ বাহ্যিকতার একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থাও আছে। যদি এর প্রতি দৃষ্টি না রাখা হয় তাহলে তো বাহ্যিকতা অভিশাপের রূপ পরিগ্রহ করে। নামায বড়ই ভাল ইবাদত। কিন্তু যদি তোমরা কেবল বাহ্যিক নামাযই পড়তে থাকো ; অভ্যন্তরীণ নামায না পড়ো তাহলে ঐ নামায অভিশাপে পরিণত হবে। রোযা বড় উৎকৃষ্ট ইবাদত। কিন্তু যদি তোমরা বাহ্যিক রোযার সাথে অভ্যন্তরীণ রোযা না রাখো তাহলে এ বাহ্যিক রোযা অভিশাপের রূপ লাভ করবে। ইহা ঐ কথাই যা কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা বর্ণনা করেছেন- ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন (সূরা মাউনঃ ৫ আয়াত) অর্থাৎ কতক নামাযী এমন যে, নামায তাদের জন্যে ধ্বংস ও অভিশাপে পরিণত হয়। মুসলমানদের যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সবকিছু সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, এ কারণে তারা ধোঁকায় পতিত হয় নি। এভাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়াও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিলো। তিনি বলেছিলেন–

পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, "তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপন হইতে কিছু বলিবেন না। কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগাম ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন" (১৬ঃ১৩)।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কথাটিকে ব্যাখা করে দেবার ফলে–এমকি তিনিও ঐ কথাই বলেছিলেন যা কিনা মসীহ্ আলায়হেস সালাম বলেছিলেন– 'মুসলমানদের ধোঁকা লাগেনি আর তারা শরীয়তকে অভিসম্পাত হিসেবে নির্ধারণ করে নি বরং কেবল ঐ আমলের কারণে শরীয়তকে অভিসম্পাত হিসেবে নির্ধারণ করেছে যার সাথে অন্তরের পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও খোদা-ভীতি অন্তর্ভুক্ত না থাকে।

(অবশিষ্টাংশ ২৫ পাতায় দ্রষ্টব্য)

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী

(পঞ্চম কিস্তি)

চতুর্থ প্রশ্ন

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন যদি মওদুদী সাহেবের মতে আহমদীয়া জামাত 'খাতামুন্নাবীয়ীন' আয়াত এবং 'লানাবীয়া বা'দী' প্রভৃতি হাদীসের এই অর্থ করিবার ফলে 'খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী' হয়, তবে কি এই তেরজন বুযুর্গানে দীনের উপরও তিনি কুফরের ফতওয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত?

ইস্‌লামী পরিভাষায় 'নবুওয়ত' অর্থ

নবুওয়তের জন্য ইস্‌লামে দুইটি পারিভাষিক শব্দ আছে। মুকাররম মৌলবী সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাসান আমরোহী সাহেব তৎপ্রণীত 'কাউকাবে দুর্‌রী' নামক কিতাবে লিখিয়াছেনঃ

"ইসলামী পরিভাষায় নবুওয়ত হইতেছে বিশেষ প্রকারে ঐশী-সংবাদ দান এবং ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার নবুওয়ত তশ্‌রীয়ী বা 'শরীয়তবাহী'। ইহা খতম হইয়াছে। **দ্বিতীয় প্রকার** নবুওয়ত 'সংবাদ দান অর্থে'। ইহা বন্ধ হয় নাই। সুতরাং, ইহার যাবতীয় প্রকারসহ ইহাকে 'মুবাশ্‌শেরাত' (সুসংবাদ) বলা হয়" [কাউকাবে দুর্‌রী]।

আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার দাবী প্রথম প্রকারের নহে, দ্বিতীয় প্রকারের। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলেন ঃ

"নবুওয়ত দ্বারা আমি এই বুঝাই না যে, নাউযুবিল্লাহ্ (আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লই) আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া নবুওয়তের দাবী করি, কিংবা কোন নুতন শরীয়ত আনিয়াছি। আমার নবুওয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায় প্রাপ্ত বহু ঐশী বাক্যালাপ মাত্র বুঝায়। ঐশী বাক্যালাপ আপনারাও স্বীকার করেন। সুতরাং, ইহা শুধু শব্দ নিয়া বাকবিতন্ডা। অর্থাৎ, আপনারা যে বিষয়ের নাম 'ঐশী বাক্যালাপ' রাখেন, আমি উহার প্রাচুর্যের নাম ঐশী আদেশে 'নবুওয়ত' রাখি" ['তাতিম্মায় হাকীকাতুল ওহী' পৃঃ ৬৫]।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন

মওদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়াত'-এ আগমনকারী মসীহ্ সংক্রান্ত কতকগুলি রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেনঃ

"তিনি* জীবিত আছেন অথবা ইন্তেকাল করেছেন– এ আলোচনা এখানে অবান্তর। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি এন্তেকাল করেছেন তাহলেও আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করে আবার দুনিয়ায় নিয়ে আসবার ক্ষমতা রাখেন। ['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ ৬২ পৃঃ, উর্দু সংস্করণ ৫৪ পৃঃ]।

হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের হায়াত ওফাতের তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইহা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ঈসা আলায়হেস্ সালামকে ওফাত-প্রাপ্ত বলিয়া প্রত্যয় করিবার ফলে আহ্‌মদীয়া জামাত হযরত মসীহ্ ইব্‌নেমরিয়মের নযূলকে একজন উম্মতী ব্যক্তির রূপক আবির্ভাব বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে, মওদুদী সাহেবের এই তর্ক এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টার কারণ–তিনি ভাল মত জানেন যে, আহ্‌মদীয়া জামাতের সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকা প্রমাণ করিবার মত সাহস তাঁহার নাই। কারণ কুরআন করীমের স্পষ্ট উক্তি "ওয়া কুনতু আলায়হিম শাহীদাম্মাদুম্‌তু ফীহিম ফালাম্মা তাওওয়াফ্‌ফায়তানী কুনতা আনতার রকীবা আলায়হিম"

তাঁহার মৃত্যুর উজ্জ্বল দলীল। হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম এই বাক্য দ্বারা খোদাতাআলার হুযূরে বলিতেছেন ঃ

"আমি আমার জাতির মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত দিলে, অতঃপর তুমিই তাহাদের নিগরান ছিলে" [সূরা মায়েদা, শেষ রুকূ]।

অন্য কথায় তিনি বলেন যে, তাঁহার জাতি তিনি উপস্থিত থাকা কালে–অর্থাৎ, তাঁহার জীবদ্দশায় বিকৃত হয় নাই। তাঁহার জীবনকালে তাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে উপাস্যে পরিণত করে নাই। তাহারা বিকৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার ওফাতের পরেই বিকৃত হইয়াছে, যখন তাঁহার পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছিল। যেহেতু হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের উম্মতের ধর্ম-মত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এ জন্য হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের ওফাত তাঁহার এই বিবৃতি অনুসারে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত।

সেইরূপে হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"নিশ্চয় ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম এক শত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন" ['কানযুল্‌উম্মাল', ১২ খন্ড তিব্রানী]।

সুতরাং, তাঁহার এই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকার ধারণা এই সকল স্পষ্ট উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। মৌলবী মওদুদী সাহেব তাঁহাকে **ইন্তেকাল করেছেন** বলিয়া ধরিয়া নিয়াও তিনি পুনরুজ্জীবিত হইবেন বলিয়া ধারণা প্রকাশ করা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিসমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে একেবারেই বাতিল। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ

"আল্লাহ্‌তাআলা আত্মাগুলিকে উহাদের মৃত্যুর সময় আয়ত্ত করেন এবং যাহারা মরে না, তাহাদিগকে নিদ্রার মধ্যে হরণ করেন। অতঃপর, যে আত্মার মৃত্যু ঘটান তাহাকে রোধ করেন এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান" [সূরা যুমার, রুকূ ৫]।

এই আয়াত এ কথার জ্বলন্ত নিদর্শন যে, যে আত্মার মৃত্যু ঘটে, উহাকে আল্লাহ্‌তাআলা রোধ করিয়া রাখেন–অর্থাৎ, পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান না। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

"[পার্থিব জীবনের শেষে] তোমরা নিশ্চয়ই মরিবে। অতঃপর, তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনই পুনরুজ্জীবিত করা হইবে" [সূরা মুমেনূন, রুকূ ১]।

এই আয়াতও স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, দৈহিক মৃত্যুর পর এ পৃথিবীতে পুনরায় জীবিত হওয়া খোদাতাআলা অমোঘ নিয়মের বিরোধী এবং মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী কিয়ামতের সময় মাত্র পুনরুজ্জীবিত হইবে।

* অর্থাৎ, বনী ইস্রাইলী ঈসা মসীহ নাসেরী (আঃ)

সেইরূপ, হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবেরের পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আন্হু শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি খোদাতাআলার হুযূরে উপস্থিত হইলে, খোদাতাআলা তাঁহাকে বলিলেনঃ

'তোমান্না আলা উতিকা'

"তুমি কি চাও বল, আমি তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করি।"

ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) পুনরায় জীবিত হইয়া পুনরায় খোদাতাআলার পথে নিহত হওয়ার আকাঙ্খা জানাইলেন। তাঁহার এই আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে পর খোদাতাআলা বলিলেন ঃ

"আমি (বিধান) বাণী দিয়াছি ঃ যাহারা মরে তাহারা কখনো পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবে না।" ['মিশ্কাত, বাব জামেউল্ মনাকেব]।

অন্য কথায়, আল্লাহ্তাআলা তাঁহার বিধানের কারণে তাঁহার ঐ আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন না। অথচ তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তিনি এইরূপ আকাঙ্খা করিলেন যাহা খোদাতাআলা পূর্ব প্রদত্ত বিধানের বিরোধী। সেইজন্য হযরত জাবের রাযিআল্লাহু আন্হুর পিতার আগ্রহ খোদাতাআলা পূর্ণ করিলেন না।

সুতরাং, মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন কুরআন মজীদে বর্ণিত খোদাতাআলার নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধে বলিয়া মওদুদী সাহেবের এই ধারণা যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনরাগমন করিবেন- সম্পূর্ণ অলীক। ইহা ভ্রমাত্মক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার কোনই মূল্য নাই। **সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উপায়ে তিনি মুসলমানগণকে এই বৃথা কল্পনার জালে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন।** এই বিষয়টি শুধু আল্লাহ্তাআলার কুদরতের উপর ন্যস্ত করা যায় না। যদিও মৃতকে জীবিত করিবার মহাশক্তি তাঁহার আছে, তবু এ পৃথিবীতে ইহার প্রকাশ তাঁহার অঙ্গীকার ও নিয়মের বিরোধী।

পঞ্চম প্রশ্ন

কিন্তু যদি হযরত মসীহের (আঃ) ওফাত স্বীকারপূর্বক তাঁহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াও ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে ইহাতে আমাদের এই প্রশ্নঃ ঈসা আলায়হেস্ সালাম 'ইন্তেকাল' করিবার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া আগমন করিলে মওদুদী সাহেব ঐ সকল হাদীসের কি ব্যাখ্যা করিবেন, যেগুলি তিনি হযরত মসীহের আকাশ হইতে অবতরণের প্রমাণস্বরূপে তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন? যদি হযরত মসীহের আকাশ হইতে অবতরণের অর্থ তাঁহার পুনর্জীবন হইতে পারে, তবে ইহার এই অর্থ হইতে পারে না কেন যে, এই সকল হাদীসের অর্থ কোন উম্মতি ব্যক্তি হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের সদৃশ হইয়া আগমন করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঐশী-সাহায্য থাকিবে? কারণ মৃত ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া আসা, কুরআন করীম এবং আ হাদীসে নব্বী বর্ণিত কানুনের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা কুরআন করীমের কোন আয়াতের বিরোধী নয়।

আহ্মদীয়া সেল্সেলার প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ

'স্মরণ রাখিতে হইবে, আমার এবং এই সকল লোকের মধ্যে এই এক বিষয় ব্যতীত আর কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিগুলি ছাড়িয়া ইঁহারা হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের জীবিত থাকা বিশ্বাস করেন এবং আমি কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত স্পষ্ট উক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইমামগণের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত মতানুসারে হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের ওফাত স্বীকার করি এবং 'নযূলের" সেই অর্থই গ্রহণ করি, যাহা ইতোপূর্বে এলীয় নবীর পুনরাগমন ও নযূল সম্বন্ধে হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম করিয়াছিলেন।

"তোমরা না জানিলে যাহাদের নিকট স্মারক-পুস্তক আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর" (সূরা নাহল, ৬ষ্ঠ রুকূ)। আমরা কুরআন শরীফের স্পষ্ট উক্তি-

"যাহাদের উপর মৃত্যু আসে তাহাদিগকে রোধ করিয়া রাখেন" এর উপর ঈমান রাখি। এই পৃথিবী হইতে যে সকল মানুষ মহাপ্রস্থান করে, তাহারা পৃথিবীতে পুনর্বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয় না। এইজন্য খোদাও তাহাদের জন্য কুরআন শরীফে কোনই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই যে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কীরূপে বন্টনকৃত মাল পাইবে? (আইয়ামুস্সোলেহ্, ৮৮-৯৯ পৃঃ)

মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

"মোদ্দা কথা হইল এই যে, যে ব্যক্তি হাদীসে বিশ্বাস রাখেন তাকে মান্তে হবে যে, আগামীতে সেই ঈসা ইব্নে মরিয়মই আগমন করবেন এবং তিনি পয়দা হবেন না বরং অবতীর্ণ হবেন"

[খত্মে-নবুয়াত' বাঙলা সংস্করণ, ৬৩-৬৪ পৃঃ]।(চলবে)

অনুবাদ ঃ মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার

ইনকিলাবে হাকীকী

(১৬ পাতার পর)

কিন্তু মসীহি জামাত মসীহ্ (আঃ)-এর কথায় ধোঁকায় পতিত হয়েছে এবং যখন তাদের আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হলো তারা তাদের দুর্বলতার প্রভাবের ফলে ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করলো এবং শরীয়তকে অভিসম্পাত মনে করতে লাগলো। আর এ দিকে মনোনিবেশ করলো না যে, যদি উহা অভিসম্পাত হয় তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর হাওয়ারী (শীষ্য)গণ রোযা রাখতেন কেন? ইবাদতসমূহ কেন পালন করতেন? মিথ্যা কথা বলা থেকে কেন বিরত থাকতেন? আর এভাবে পুণ্যের অন্যান্য কাজ কেন করতেন? এ অবস্থা থেকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, তারা বাহ্যিক ইবাদতকে অভিসম্পাত মনে করতেন না বরং ইহা মনে করতেন যে, যদি বাহ্যিকতার সাথে অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধন না করা হয় তাহলে ঐ বাহ্যিকতা অভিসম্পাতে পরিণত হয়।

মোট কথা আইইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস-(সূরা বাকারা)-এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট পবিত্র অন্তরের বিশেষ রহস্য উন্মোচিত করা হয়েছিলো। আর পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণ শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব দানের জন্যে তাদেরকে বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করা হয়েছিলো। আর বাহ্যিক নির্দেশাবলীর অভ্যন্তরীণ মাহাত্ম্যসমূহ তাদেরকে শিখানো হয়েছিলো এবং ঐ যুগে সুফীবাদ পূর্ণতার পথে পদক্ষেপ রাখতে শুরু করেছিলো। (চলবে)

অনুবাদ– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(৪র্থ কিস্তি)

মানব জীবনে ভারসাম্যের গুরুত্ব

দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—মানব জীবনের প্রধান তিনটি দিক। অন্যান্য প্রাণী এবং বস্তু জগতের মাঝে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ নিয়ে প্রশ্ন ওঠতে পারে। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কুরআন হতে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য যথাসম্ভব সীমিত রাখা হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেনঃ (বাংলা তর্জমা) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে?' (২২ঃ১৯ আয়াতাংশ) আল্লাহ্‌র বিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রকৃতিতে চেতন ও অচেতন সবকিছুর জন্য আল্লাহ্ অটল নিয়ম নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন যা সকলকে মেনে চলতে হয়, যাকে 'সেজদা' বলা হয়েছে। (২) অপর বিধান হলো নবী-রসূলগণের মারফত প্রেরিত শরীয়তের বিধান। তা শুধু মানুষের জন্য। এ বিধান মানা না মানার স্বাধীনতা আদম সন্তানদেরকে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ বিধান দ্বারা আল্লাহ্ মানব জীবনে 'ভারসাম্য' রক্ষার পথ বাত্‌লিয়েছেন।

দৈহিক তথা বৈষয়িক জীবনের সাথে সব প্রাণীরই অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে দৈহিক জীবন যাপন করতে হয়। তবে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবজীবনে এর ব্যাপকতা অনেক বেশী। বাঁচার জন্য সব প্রাণীকেই অনেক প্রয়াশ চালাতে হয়। তন্মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। খাদ্যের বেলাতেও পরিমাণ ও পুষ্টিগত ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। মানুষের বেলায় অন্ন ছাড়াও বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকেও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। এসব ছাড়াও জীবনের মান উন্নয়নে প্রয়োজনের শেষ সীমা টানা দুরূহ ব্যাপার।

সমাজনির্ভর জীব হওয়ায় মানুষ এককভাবে জীবন ধারণে অপারগ। সামাজিক জীবনই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। সামাজিক জীবন সুন্দর শোভন করার জন্য মানুষকে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমষ্টি জীবনে অনেক নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়, আদর্শের আশ্রয় নিতে হয়। মৌল নিয়মনীতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা না গেলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে ওসব কার্যকর করার ব্যবস্থা দিতে পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাতে প্রয়োজনীয় সাড়া না দিলে সমাজ জীবনে স্থবিরতার আগ্রাসন ঘটে। তখন ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়ার বাড়াবাড়ি সমাজ জীবনের ভারসাম্য চূরমার করে ফেলে। অপরদিকে আগপিছ গভীরভাবে বিবেচনা না করে নতুন কিছু দেখলেই তা গ্রহণের জোয়ারে ভেসে যাওয়াতে মূল্যবোধ ধ্বসে যায়, সমাজ ভয়াবহ অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়।

সমাজ জীবনে অবদান রাখার ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। তবে সব যুগেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো নিজে দুর্নীতিমুক্ত থেকে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার নিরলস প্রয়াস চালানো। বিশ্বের একক স্রষ্টার নির্দেশিত দায়িত্ব নবী-রসূলগণের নিকট ওহী-ইলহামের মাধ্যমে প্রেরিত বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে পালনের প্রয়াশই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে না তাদেরকেও সৃষ্টির সেরা হিসেবে বৈষয়িক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য। নতুবা সে নিজেই মানবতাকে পিষে মারবে। এর চেয়ে চরম বোকামি আর কী হতে পারে?

মানুষের দৈহিক (বৈষয়িক) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা না করলে মানবতার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। এমনকি তাতে জীবনই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে যায়ও। এর যে কোনটার প্রতি অবহেলা বা আতিশয্যের ছিদ্রপথে অবক্ষয়ের আগ্রাসন ঘটে থাকে। এতে ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ জীবনও বিষিয়ে উঠে। এ যেন ইতিহাসের এক চিরন্তন বিধান। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এ বিধানের কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে মনে হয় না। আমাদের দৈহিক অংগের দিকে তাকালে বিষয়টি হৃদয়ংগম করা সহজতর হবে। যেমন কোনক্রমে যদি কারো একটি পা অপরটি হতে কিছু লম্বা বা খাটো করা যায় তবে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের একটি অতীব গুরুত্ববহ অবদান হলো উল্লেখিত 'ভারসাম্য' রক্ষার জন্য দুনিয়ার সামনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরা। ইসলাম যেমন জীবন যাপনে 'সীমালংঘন' করতে বারণ করেছে তেমনি মধ্যপন্থা অবলম্বনের জোর তাগিদও দিয়েছে। স্মরণীয় যে, আপছে বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি এবং এসবের মাঝে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। একজন নিষ্ঠার সাথে সুসংগঠিতভাবে ক্রমাগত সাধনা করতে হয়। যখনই এবং যেখানে এ সাধনায় ভাটা পড়ে তখনই আদম সন্তানদের পতন শুরু হয়, হীনত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

অবক্ষয় জর্জরিত চরিত্র নিয়ে চাঁদে বসবাস শুরু করলে চাঁদ তাতে কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। এর প্রতিবিধান বাসিন্দাদেরই করতে হবে। তবেই চাঁদ কলংকমুক্ত থাকবে মরু বা মেরু অঞ্চলে অথবা মহাসাগরের গহীনে বসবাসের ব্যাপারেও একই কথা খাটে।

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শোক সংবাদ

গত ০৩/৪/৯৮ইং রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত ৪.৪৫ মিনিটে মোহাম্মদ মতলুবর রহমান প্রধান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানিয়াল খাতা (নীলফামারী) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁরবয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য ও আমাদের সকলের সাব্‌রে জামীলের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করছেন মরহুমের বড় পুত্র মেরাজুল ইসলাম প্রধান, জেলা কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, বৃহত্তর রংপুর।

সন্তান লাভ

জার্মানীতে অবস্থানরত বড় ছেলে জুবায়ের আহমদ লিপুকে গত ১৩ই মার্চ ৯৮ইং রোজ শুক্রবার জার্মানীর সময় বিকাল ৪টা ২৭ মিনিটে আল্লাহ্‌তাআলা একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নব জাতকের সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও তাদের পরিবারের দীন-দুনিয়ার সার্বিক উন্নতি এবং সে যেন আহমদীয়তের উত্তম খাদেম তৈরী হয় তার জন্য সকল আহমদী ভাই- বোনের নিকট দোয়া চেয়েছেন জনাব জায়েদ আহমদ (দাদা), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

া বলে

শিদ আর্কিটেক্স সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করছেন।

তিপয় সদস্যকে দেখা যাচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘানা-এর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ মাসুদ জামাল জনষ্টন বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করছেন।

এইচ. ই. মিঃ কোনান এন' ডা কোটে ডি' আইভয়ের, ঘানার রাষ্ট্রদূত জামাতের আমীর ওয়াহাব আদম থেকে পুস্তকাদী ও ক্যালেন্ডার গ্রহণ করছেন।

আগবোজিউম-এর টোগবে আহাদজেই সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন।

আব্দুস সালাম
তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান বিকাশের স্বপ্নদ্রষ্টা

আবদুল্লা আল-মূতী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবী মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তার একভাগে আছে মূলতঃ পশ্চিমের (তার সঙ্গে কিছু পূর্বেরও) শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি; এসব দেশের অধিকাংশের উন্নয়ন ঘটেছে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের কাল থেকে গত প্রায় দু'শ বছর ধরে। দ্বিতীয় দলে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে প্রধানত বিশ শতকে এসে। তৃতীয় দলে আছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি যে দলে পড়ে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলি দেশ।

তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশ প্রায় সবই দু' শ'বছর ধরে ছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশ এবং তাদের তীব্র শোষণের কারণে এই দেশগুলির অর্থনীতির বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তাই এক হিসেবে দেখতে গেলে প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বকে আজ ফেলা চলে এক দলে-যাদের বলা যায় শিল্পোন্নত বিশ্ব; আর তৃতীয় বিশ্বকে ফেলতে হয় আরেক দলে, যাদের আজকের এক শোভন অভিধা হল উন্নয়নশীল বিশ্ব। আজ বলা হয়ে থাকে শিল্পোন্নত দেশগুলির বাসিন্দা পৃথিবীর ২৫ শতাংশ মানুষ বাস করে পৃথিবীর দুই পঞ্চমাংশ এলাকায়, আর ভোগ করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ সম্পদ। আর বাকি ৭৫ শতাংশ মানুষ বাস করে পৃথিবীর তিন পঞ্চামাংশ এলাকায়, আর তাদের ভাগ্যে জোটে মাত্র পৃথিবীর ২০ শতাংশ সম্পদ। এরই এক অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দারিদ্র, ক্ষুধা, ব্যাধি আর অশিক্ষা এসব দেশের মানুষের নিত্য সহচর। আজ এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে শক্তির ফলে পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ড তাদের পদানত করে ফেলেছিল সে হল উন্নত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলেই তারা অস্ত্রের জোরে যেমন দখল করেছে এসব দেশের জমি তেমনি তাদের পণ্যদ্রব্য দিয়ে দখল করেছে এসব দেশের বাজার। আর শুধু দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, এসব দেশ যাতে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতিয়ার অর্জন করতে না পারে তার জন্যও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চেষ্টার অন্ত নেই। এক হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেখানে আজ রয়েছে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদের ৯৫ শতাংশ সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করে মাত্র ৫ শতাংশ বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ। সারা পৃথিবীতে আজ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ গবেষণা কাজ হয় তার হারও উন্নত আর উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে মোটামুটি একই ধরনের।

এই কথাগুলি তৃতীয় বিশ্বের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অসম সাহসী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম যেমন করে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন এমন আর কেউ করেননি। তাঁর উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে ত্রিয়েস্তে একটি বক্তৃতায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেনঃ আজ তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শেষ বিচারে, উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে পার্থক্যের যা মূল কারণ তা হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৃষ্টি, অর্জন ও প্রয়োগ। যে কোন দেশের জীবনমান আজ নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর। অর্থনীতি এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে উত্তর আর দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে আজ যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পার্থক্য, না বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার পার্থক্য কেন যে উত্তরের দেশগুলি আজ সারা পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হল আর কেনই বা তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে? দক্ষিণের দেশগুলিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ এমন অপ্রতুল এবং তার প্রয়োগ এত সামান্য কি করে হল?....

এরপর তিনি তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির পশ্চাদপদতার তিনটি প্রধান কারণ নির্দেশ করেছেনঃ

১. মৌলিক অথবা প্রয়োগিক যে কোনো ধরনের বিজ্ঞানের প্রতি অর্থপূর্ণ দায়বদ্ধতার অভাব এবং সেই সঙ্গে প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার প্রতি আগ্রহের অনুপস্থিতি;

২. যথাযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর অভাব; এবং

৩. যে পদ্ধতিতে এসব দেশে আজ বিজ্ঞানের চর্চা চলছে।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্বভাবতই তিনি উন্নয়নশীল দেশ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে কি করে শক্তিশালী করে তোলা যায় তার জন্য নানামুখী প্রস্তাবও রেখেছেন। প্রফেসর সালাম এই প্রস্তাবগুলি করতে পেরেছেন প্রধানত এ জন্য যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অবিসংবাদী। আর শুধু বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখে তিনি ক্ষান্ত হন নি। এই বিজ্ঞানকে যাতে জনকল্যাণে প্রয়োগ করা যায় সে জন্য তিনি বহু ধরনের আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সূত্রপাত করেছেন এবং সে সব কর্মপ্রচেষ্টায় নেতৃত্বে দিয়েছেন।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। পাকিস্তানের পরমাণু-শক্তি কমিশন এবং পরমাণু-গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ১৯৬৪ সালে ত্রিয়েস্তে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনি এর পরিচালক ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান; এর আগে তাঁদের এ ধরনের সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত নানা দেশে তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য নানা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আব্দুস সালামই করেছিলেন। এই কেন্দ্রের বার্ষিক বাজেটের নব্বই শতাংশ দেন ইতালির সরকার; বাকি দশ শতাংশ আসে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এবং জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে।

ত্রিয়েস্তে তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমীর প্রতিষ্ঠাও তাঁর এক অমর কীর্তি। ১৯৮১ সালে এই একাডেমী স্থাপনের প্রস্তাব আব্দুস সালামই করেছিলেন। চার বছর ধরে প্রস্তুতির পর ১৯৮৫ সালের ৫ জুলাই জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল পেরেজ দ্য কুয়েলার ত্রিয়েস্তে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এটিও তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এক অন্যন্য প্রতিভার নাম সালাম

আবদুস সালাম এক অসাধারণ পদার্থবিদ ও একমাত্র মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জগতে তাঁর প্রধান পরিচয় পরমাণুর মৌলকণার মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার উপলব্ধি সম্পর্কে আবিষ্কারের জন্য। সালামের জন্ম হয় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝাং নামে ছোট শহরে (বর্তমান পাকিস্তান) ১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারী। তিনি যে অতি মেধাবী ছিলেন তা তাঁর শৈশবেই প্রকাশ পায়। ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের প্রায় ৪০,০০০ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ঝাং শহর থেকে তিনি সারা পাঞ্জাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর পড়তে যান লাহোরে সরকারী কলেজে; সেখানে বি.এ. ও এম.এ. (গণিত) পরীক্ষায় সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পান। তার ফলে একটি বিশেষ সরকারী বৃত্তি নিয়ে সে বছরই একটি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতে কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পান। সেখানে গণিতে ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ১৯৪৯ সালে দু'বিষয়েই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এক বছর কেমব্রিজে গবেষণা করার পর তিনি ১৯৫১ সালে একটি ফেলোশিপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড স্টাডিতে কিছুদিন রবার্ট ওপেনহাইমারের সঙ্গে গবেষণা করেন। সে বছরই তিনি কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি আবার কেমব্রিজ ফিরে যান এবং ১৯৫৬ সালের শেষ পর্যন্ত সেখানেই গণিতের প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তির জন্য পরমাণু শক্তি সম্মেলনের সচিব হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৯৫৮ সালেও আবার তিনি অনুরূপ কাজে জড়িত হয়েছিলেন।

১৯৫৭ সালে ডঃ সালাম মাত্র ৩১ বছর বয়সে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পেরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজিতে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার প্রফেসর নিযুক্ত হন। সে বছরই তিনি পেলেন তাঁর প্রথম বড় রকম আন্তর্জাতিক সম্মান; কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গত তিন বছরে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে হপকিন্স পুরস্কার দেয়। বস্তুর একটি মৌলিকণিকা 'নিউট্রিনো' সম্পর্কে আধুনিক ধারণা তিনিই প্রথম দেন। পরের বছরই তিনি পেলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাডাম্স পুরস্কার। এরপর তিনি নির্বাচিত হলেন বিলেতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো; তাঁর চেয়ে কম বয়সী ফেলো সে সময়ে আর কেউ ছিল না। সেই থেকে একের পর এক আবিষ্কার তিনি করে গেছেন আর ধারা বর্ষণের মতো সম্মানের সমারোহ তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে। ইম্পেরিয়াল কলেজে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর কাছে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করেছে; তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই থেকেছে-তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশ থেকে।

কী তাঁর আবিষ্কার

সালাম প্রধানত কাজ করেছেন বস্তুর মৌলিকণিকার রহস্য নিয়ে; তাঁর সেসব আবিষ্কারের গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে হলে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের কিছু মূল হাতিয়ার সম্বন্ধে জানা থাকার দরকার। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা পরমাণুর গভীর কন্দরে নানা মৌলকণা আবিষ্কার করতে করতে দেখলেন কণিকার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর তাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নানা বিচিত্র গুণাগুণের সমাহার। তার মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে বিভিন্ন কণিকার চরিত্রের প্রতিসাম্য। সালামের দেওয়া হিসেব থেকে জানা গেল ওমেগা মাইনাস নামে একটি কণিকার অস্তিত্ব। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুক হ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়ে সেই কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বস্তুর পরমাণুর ভেতরকার রূপ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এই সময় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটল তার গোড়ায় ছিল আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আর ম্যাক্স প্লাঙ্কের (১৮৫৮-১৯৪৭) কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তারপর আরও অসংখ্য নতুন নতুন আবিষ্কার আমাদের সামনে বিশ্বজগতের অমিত রহস্যের এক বিস্ময়কর জগতকে উন্মোচিত করেছে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে ধনাত্মক প্রোটন আর বিদ্যুৎবিহীন নিউট্রন কণিকা। এখন সমস্যা হল পরমাণুর কেন্দ্রের ধনাত্মক কণিকাগুলি ছিটকে না গিয়ে কোন শক্তিতে গায়ে গায়ে লাগানো থাকে। দেখা গেল বস্তুর খানিকটা উধাও হয়েই পরমাণু কেন্দ্রের বাঁধন-শক্তি সৃষ্টি হয়। এই শক্তিকে বলা হয় তীব্র বল। পরমাণুর কেন্দ্রে আরো এক ধরনের বল কাজ করে– সে হ'ল পরমাণু থেকে ক্রমে ক্রমে যখন বিটা কণিকা বা ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে পরমাণু কেন্দ্রের ক্ষয় ঘটে; একে বলা হয় ক্ষণী বল। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রে একটি বিদ্যুৎহীন নিউট্রন কণিকা যখন পরিণত হয় ধনাত্মক বিটা কণিকা বেরিয়ে আসে। অবশ্য তবু পরমাণু কেন্দ্রিণের গড়নের রহস্য পুরোপুরি ভেদ হয়নি। কখনো কেন্দ্রিণকে মনে হয় একটা তরল। বিন্দুর মতো, কখনো কোষগুচ্ছের মতো। আর তার ওপর ভিত্তি করেই তার নানা ধর্ম আর চালচলন ব্যাখ্যা করতে হয়।

বস্তুজগতে মূলতঃ চারিটি বলের মিথস্ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল মহাকর্ষ বল, পরমাণু কেন্দ্রের প্রবল বল, ক্ষণি বল এবং বিদ্যুৎচৌম্বক বল। বিজ্ঞানীদের একটি দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্ন মহাবিশ্বের নানা বলের মধ্যে মূল ঐক্যের সন্ধান। নিউটন সতের শতকের শেষে অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ শক্তির অভিন্নতা আবিষ্কার করে নানা বলের একীকরণের সূত্রপাত করেছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-৭৯) মাত্র চারটি সহজ সমীকরণের সাহায্য দেখিয়েছিলেন যে, তড়িৎ আর চুম্বক বল মূলতঃ একই; এভাবে তিনি তড়িৎচুম্বক বলের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। এই বলের বাহন হল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ; উনিশ শতকের শেষে হাৎস এই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ আবিষ্কার করেন।

তারপর আইনস্টাইন চেষ্টা চালান তড়িৎচুম্বকীয় ও মহাকর্ষ বলের একীকরণের জন্য; কিন্তু তাঁর সারা জীবনের সেই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা সফল হয়নি। ষাটের দশকে এনরিকো ফের্মি (১৯০১-৫৪) তড়িৎচুম্বকীয় ও ক্ষীণ বলের একীকরণের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ষাটের দশকে এসে সালাম–ভাইনবার্গ আর গ্লাসহাউ দেখতে সক্ষম হলেন যে, তড়িৎচুম্বক আর পরমাণু কেন্দ্রিণের ক্ষীণ বল আসলে ক্ষীণ বিদ্যুৎ বলের দু'টো ভিন্ন প্রকাশ।

সালাম ও স্টিভেন ভাইনবার্গ (Steven Weinberg) দু'জনেই পৃথকভাবে পরমাণু কেন্দ্রিণের বিভিন্ন কণার দুর্বল মিথস্ক্রিয়া ও বিদ্যুৎচুম্বক বলের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে কিছু সমীকরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে দু'জনে মিলে একটি সমন্বয় তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এ ধরনের তত্ত্ব আরো অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শুধু তাঁদের তত্ত্বেরই সমর্থন পাওয়া যায়। তার ফলে ১৯৭৯ সালে তাঁদের দু'জনকে এবং মার্কিন পদার্থবিদ শেলডন গ্লাসহাউকে Glashow একযোগে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। গ্লাসহাউ এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে মূলবান অবদান রেখেছিলেন।

এই তত্ত্বের পরীক্ষার জন্য ক্ষীণ বলের দূত হিসেবে দরকার "ডব্লিউ, ডব্লিউ ও জেডঃ নামে কণিকার অস্তিত্ব; তাদের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে ৮০-৯০ গুণ বেশি। সার্নের বিজ্ঞানীরা 'বীম কলাইডার' কণাত্বরক যন্ত্রে ৫৪০ বিলিয়ন ইলেকট্রন প্রোটনের সংঘাত ঘটালেন; তা তেকে এসব কণার হদিস পাওয়া গেল আর সালাম-বাইনবার্গের তত্ত্বের সমর্থনও মিলল। হিসেব করে দেখা যায় প্রতি ১০ কোটি সংঘাতে একটিমাত্র 'ডব্লিউ' কণিকা এবং প্রতি ১০০ কোটি সংঘাতে একটি মাত্র 'জেড' কণিকা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। এ থেকেই এই পরীক্ষণে অতি ক্ষণজীবী 'ডব্লিউ' ও 'জেড' কণিকা একেবারে সরাসরি ধরা পড়ে না; ধরা পড়ে তাদের ক্ষয়ের নানা অবশেষ কণিকা। এভাবেই ১৯৮৩ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষায় সালাম-ভাইনবার্গ তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ হয়।

সালামের উর্বর গবেষণা কাজের আরো নানামুখী অবদানের মধ্যে রয়েছে দুই অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্ব এবং ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটি লঙ্ঘণ, ক্ষীণ আধানহীন প্রবাহ, মৌল কণার প্রতিসাম্য, পুনঃসাধারণীকরণ তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থবিজ্ঞানের আরো নানা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

নোবেল পুরস্কার ছাড়া নানা দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় আবদুস সালামকে সম্মানসূচক বিভিন্ন ডিগ্রীতে ভূষিত করেছে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে রয়েছে Symmetry Concepts in Modern physics (১৯৬৫), Aspects of Quantum Mechanics (১৯৭২), Science, Technology and Science Education the Development of the South (১৯৯০)

তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান-প্রবক্তা

এই অমর বিজ্ঞানসাধক তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি নিখিল পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন উপলক্ষে মূল সভাপতি হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন। সে সময়ে (১১ জানুয়ারী, ১৯৬১) তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ

..... কিছু অভ্যন্তরীণ পূর্বশর্ত জাতিকে পূরণ করতে হবে আমাদের সামাজিক রূপান্তর সম্ভব হবার আগেই। প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল এই যে, সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করা এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তিকে কাজে লাগানো যাতে এক প্রজন্মের মধ্যে দারিদ্র্য নির্মূল করার লক্ষমাত্রা অর্জন করা যায়। এজন্যে প্রয়োজন হবে অর্থনৈতিক লক্ষমাত্রাগুলির সার্বক্ষণিক পুনরুল্লেখ; বিশেষ করে জাতিকে বোঝানোর প্রয়োজন আছে যে, সমগ্র সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করাই এই অর্থনৈতিক নীতিমালার লক্ষ্য - শুধু তার কতক অংশকে নয়। .... আমরা যে বিপ্লবের কথা বলছি তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। এটা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব। আর তাই জাতির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়াই একান্ত প্রয়োজন। .....

আবদুস সালামের নির্দেশিত সে বিপ্লবের সাফল্য আজো অর্জিত হয়নি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সে বিপ্লবের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশের আজকের এবং আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের জন্য তিনি চিরদিন এক অবিস্মরণীয় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন *(দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯-১১-৯৬ ইং)*।

প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম : একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

"আমার ফির্কার লোক জ্ঞান ও মা'রেফতে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে যে, নিজেদের সত্যতার জ্যোতিতে নিজেদের দলীল ও নিদর্শনাবলীর আলোকে সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া-হযরত ইমাম মাহদী আলায়হেস্‌সালাম)।

এ এত বলবে যে দুনিয়া শুনবে!

সাধারণত শিশুরা ছোটবেলা থেকেই কথা বলা শুরু করে। কিন্তু আব্দুস সালাম সাহেব এমন বয়সে পৌঁছেও কথা বলেন নি। তাঁর পিতা হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর পুত্রের জন্যে হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রাঃ)-এর দ্বারা দোয়া করান। সুতরাং চৌধুরী সাহেব বর্ণনা করেন।

"একবার হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং মেহমান হন। স্নেহের আব্দুস সালাম ঐ সময়ে ছোট ছিলো। আর সে তখন কথা বলতো না। তার মা এজন্যে খুবই ভাবতো। আব্দুস সালামকে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তার কথা না বলার ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং তাঁকে দোয়া করতে বলে। মাওলানা সাহেব খুবই আদর করে স্নেহের আব্দুস সালামকে লক্ষ্য করে বলেন, "এস, বোবা ছেলে কথা বলছো না যে, আর বলতে থাকলেন যে, **ইনশাল্লাহ্ এত কথা বলবে যে, দুনিয়া শুনবে।**"

নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম (জন্ম ১৯২৬ ইং-মৃত্যু ১৯৯৬) তিনি ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তড়িৎ চুম্বকীয় বল ও দুর্বল পারমাণবিক বল যে অভিন্ন তা তিনি প্রমাণ করে দেখান। তাই তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাকী দুটো বল-এরা সবাই মিলে যে একই বল তা তিনি দেখাবার চেষ্টা করে গেছেন। হয়ত তার এ মতবাদ যে সত্য তা ভবিষ্যত একদিন প্রমাণ করে দেখাবে।

ডঃ সালাম সম্পর্কে একটি ভিন্নধর্মী পত্রিকার অভিমত

"তিনিই প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিক-এর (নোবেল পুরস্কার) গৌরবময় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের সূচনা লগ্নে তাঁর কৃতিত্ব সমগ্র মুসলিম জাহানের বৈজ্ঞানিকদের জন্য বিজ্ঞান চর্চার এ অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।" *(দৈনিক সংগ্রাম, ২১ শে নভেম্বর, ১৯৭৯ ইং)*

জুমুআর খুতবা

প্রকৃত মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যাবলী

**[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ১৩ই মার্চ, ১৯৯৮ ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]**

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর সূরা বনী ইস্রাঈলের ২০ তম আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

[অর্থঃ "যে মুমিন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে– ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্যই মূল্য দেওয়া হবে"]

অতঃপর হুযূর বলেন, উক্ত আয়াতদ্বয় আমি বিগত খুতবায় এবং তৎপূর্বেও তিলাওয়াত করেছিলাম, আর এতদ্সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছিলাম যখন সময় শেষ হয়ে যায়। সেখান থেকেই এ বিষয়-বস্তুটির অবতারণা করতে যাচ্ছি। পুনরায় এ আয়াতগুলোর উপর কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন নেই।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "মুত্তাকী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে খোদাতাআলার নিদর্শনাবলীর দ্বারা মুত্তাকী বলে সাব্যস্ত হয়। প্রত্যেকেই বলতে পারে যে, সে খোদাকে ভালোবাসে। কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) খোদাতাআলাকে সে-ই ভালোবাসে, যার ভালোবাসা ঐশী সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। যদিও প্রত্যেকে বলে থাকে যে, তার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্যধর্ম হচ্ছে সেই ব্যক্তির, যাকে ইহকালেই নূর (ঐশী জ্যোতিঃ) দান করা হয়। প্রত্যেকেই বলে যে, তাকেই নাজাত দান করা হবে। কিন্তু কেবল সে-ই নাজাতের অধিকারী, যে উক্ত দাবির স্বপক্ষে ইহকালেই নাজাতের আলোকমালা অবলোকন করে। অতএব, তোমরা সচেষ্ট হও যাতে খোদাতাআলার প্রিয় হতে পার, যাতে তোমাদেরকে প্রত্যেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা হয়।" যদ্দুর আমার স্মরণ পড়ে, এ বিষয়-বস্তুটিও যেখানে চিহ্ন দেয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যে, উক্ত উদ্ধৃতিটি যথাসম্ভব পঠিত হয় নি। কিন্তু এতদ্সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে অধিক অন্য কিছু আর বর্ণনা করব না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "হে বন্ধুগণ! এই মূলনীতিটি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর যে, প্রত্যেক জাতির প্রতি বিনম্র ব্যবহার করবে। নম্রতার দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে এবং সহিষ্ণুতার দ্বারা চিন্তা-ভাবনায় গভীরতার সৃষ্টি হয়।" সন্দেহাতীতভাবে ইহা এতো বাস্তব সত্য যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার অন্তরের গহীনে ডুব দিয়ে জানতে পারে। কিন্তু এতো স্পষ্ট সত্যটিও মানুষের জানা নেই যে, যখনই স্বভাবতঃ সে তার আবেগ-উত্তেজনার দাসে পরিণত হয়, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি (লোপ পেয়ে) ধোঁয়াটে বা কলুষিত পড়ে এবং প্রকৃত **জ্ঞান-বুদ্ধি তখনই লাভ হয় যখন মানুষ তার আবেগ-উত্তেজনা ও ক্রোধের কবলমুক্ত হয়ে এর সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠে যায়।** ক্রোধ এবং আবেগ-উত্তেজনার কবলমুক্ত হওয়ার অর্থ কখনও এ নয় যে, রাগ তাকে কখনও স্পর্শই না করে অথবা আবেগেরই সৃষ্টি হয় না। যদি আবেগানুভূতিকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসনই দেয়া হয় তাহলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন যেতে যেতে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। স্নেহ-ভালোবাসা সবই আবেগ-অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত এবং ক্রোধ-উত্তেজনার আওতায় পড়ে নানা বিষয়ের প্রতিরোধ। যদি মানুষের অন্তরে কখনও ক্রোধের সৃষ্টিই না হয় তাহলে প্রতিরোধের দিকে তার খেয়ালই যাবে না। সেজন্য উক্ত বাক্যটির দ্বারা এ অর্থ ধরে নিবেন না যে, ক্রোধ ও আবেগকে অন্তর থেকে এরূপে বের করে ফেলেন, যার ফলে (ভাবলেশহীন) মাটির পুতুলে পরিণত হয়ে যান– রাগ বা আবেগ কোন কিছুরই উদ্রেক না হয়, ফলে জীবনের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লিখাগুলো যদি গভীর মনোনিবেশে হৃদয়ঙ্গম করেন তবেই কিনা আপনারা এর সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করতে পারবেন। (কাজেই) যখন আপনারা ভাবাবেগ ও ক্রোধের বশবর্তী হন আর এমতাবস্থায় কোন ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন যা ঐ ভাবাবেগের প্রভাবাধীন হয়ে থাকে, এরূপ তাৎক্ষণিক ফয়সালার ফলশ্রুতিতে সব সময়ই নির্বুদ্ধিতার সৃষ্টি হয়- এবং ঘটনাপ্রবাহ বিরূপ আকৃতি ধারণ করে। অতএব, মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, **যখনই ক্রোধের উদ্রেক হয়, আবেগ উত্তেজিত হয়ে উঠে, তখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত থাকুন।** এ উপদেশই দিয়ে গেছেন হযরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ)। তাতে বলা হয়েছে যে, যখন ক্রোধের উদ্ভব হয়, তখন পানি খেয়ে নাও। তাতে পানি খাওয়া এবং রাগ আসার মাঝে ব্যবধান ঘটবে। তবুও যদি উত্তেজনা প্রশমিত না হয় তাহলে শুয়ে পড়। হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনা তো এ মুহূর্তে আমার স্মরণ নেই কিন্তু এর বিষয়-বস্তু ওটাই যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এ হাদীসটির অন্তর্নিহিত হিকমত হচ্ছে এই যে, ভাবাবেগ ও ক্রোধের ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করো না। এমতাবস্থায় বরং থেমে যেও এবং বিরতি দিয়ে নিভৃতে চিন্তা-ভাবনা করো। এই সেই বিরতি যা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে। এই বিরতি ব্যতিরেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটতেই পারে না। অতএব, নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-ধারাকে এই উপদেশটির অধীনে আনয়ন ও সুনিয়ন্ত্রণ করুন-যখনই কোন জিনিসের বা বিষয়ের আকাঙ্খা অন্তরে দানা বাধে, তখন যদি দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো হয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়–ওরূপ মনোভাব যেমনটি-ই হোক না কেন, তাছাড়া যদি কখনও কারও পক্ষ থেকে কোন রকম কষ্ট দেয়া হয় এবং তদ্দরুন ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে এগুলোর সঠিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার-ব্যবস্থার অনুসন্ধান করুন। এ ক্ষেত্রে যে প্রথম ও তাৎক্ষণিক পয়গাম আসে বা পরামর্শটির উদ্ভব হয়, তা ভ্রান্ত হবে। তাতে কর্ণপাত করো না। বরং ততটুকু বিরতি গ্রহণ করো, যতটুকুর উল্লেখ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) করেছেন-যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাটি থেকে স্পষ্টতঃ

বোঝা যায়। অতঃপর যখন চিন্তা করবেন তখন জ্ঞান-বুদ্ধিতে দীপ্তি এসে যাবে এবং মারেফাত লাভের সৌভাগ্য ঘটবে। এ বিষয়-বস্তুটির সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, "এই মূল-নীতিটি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো যে, প্রত্যেক জাতির সাথে বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন করবে। নম্রতায় জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে।" এই নম্রতা হচ্ছে স্থিরচিত্তে চিন্তা-ভাবনার পরবর্তী নম্রতা-যে দিকে আমি ইঙ্গিত দিচ্ছি। নচেৎ, যেখানে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী ও চাহিদানুযায়ী কোন জাতির সাথে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় ছিল, সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কঠোর ভূমিকাও প্রদর্শন করেন। যদি আপনারা এই উদ্ধৃতিটি বুঝতে না পারেন-এর মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম না করেন তাহলে যেখানে কঠোর হওয়া দরকার সেখানে কঠোর ভূমিকা গ্রহণে বিরত থাকবেন। অথচ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পদক্ষেপই হচ্ছে "ফাসাহাত ও বালাগত (মর্মস্পর্শী প্রাঞ্জলতা)। অর্থাৎ পরিস্থিতির চাহিদা পূরণ ও তদনুযায়ী উহার সঠিক উত্তরই আপনাকে মর্মস্পর্শী প্রাঞ্জলতার অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলবে (বা ওরূপ সাব্যস্ত করবে)। এতদ্দ্বারাই আপনাদের বুদ্ধিমত্তা প্রখর ও উজ্জ্বল হবে এবং এর দ্বারাই মা'রেফাত লাভ হবে। অতএব, "প্রত্যেক জাতির প্রতি বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন করো"-এর অর্থ এই নয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেখানে আর্য সমাজী হিন্দুদের কতিপয় নোংরা আক্রমণের উত্তরে কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন সেখানে তিনি যেন নিজের হিতোপদেশটিই বিস্মৃত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ নম্রতাসুলভ আচরণের ক্ষেত্রে ঐ হাদীস-বর্ণিত মধ্যবর্তী বিরতি অন্তর্ভুক্ত- স্থিরচিত্তে চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কিত বিরতি এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের বিবেকের সিদ্ধান্ত এই হবে যে, এই জাতিদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার হওয়া উচিত। আপনাদের এই নম্রতা হবে বিবেক-বুদ্ধি সম্মত মা'রেফতপূর্ণ নম্রতা। "নম্রতায় বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি পায় এবং সহিষ্ণুতায় চিন্তা-ভাবনাতে গভীরতার সৃষ্টি হয়।" যখন চিন্তা করার সুযোগ পায়, তখন মানুষ বিষয়াটির গভীরে প্রবেশ করে তৃণমূলে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক প্রকৃত রহস্যাবলী উদঘাটনে সমর্থ হয়-প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, ইরফান বা তত্ত্ব-জ্ঞানমূলক বিষয়াটি কী এবং ভাসা-ভাসা বিষয়াদি কী।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ বলছেন, "যে ব্যক্তি উক্ত পন্থা অবলম্বন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" কিশতিয়ে নূহ্ গ্রন্থে যেমন আছে যে, অমুক-অমুক ধরনের ব্যক্তি আমাদের জামাতভুক্ত নয়, অনুরূপ ভাষাতেই "কিতাবুল-বারীয়া, পৃঃ ১৭ থেকে গৃহীত এই উদ্ধৃতিটিতেও বলা হয়েছে যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে আমি যে-ধরনের জামাত চাই, সে- রকম জামাতের সে অন্তর্ভুক্ত নয়। "যদি আমাদের জামাতের মধ্যে কেউ বিরুদ্ধবাদীদের গালিগালাজ ও রূঢ় ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করতে না পারে, তাহলে তার অধিকার আছে, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার প্রত্যাশী হবার।" যদ্দুর ন্যায়বিচারের দাবী ও চাহিদা রয়েছে তা এতদ্সঙ্গে উল্লেখ করে দিয়েছেন। "যদি কেউ গালি ও কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ করতে না পারে তাহলে সে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করতে পারে।" এমন লোকও থাকে যারা সহ্য করতে পারে না-তারা যে ভ্রান্ত তা-ও জরুরী নয়। কিন্তু **তারা আহ্মদীয়া জামাতের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন, (যদিও কিনা) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদেরকে আরও উচ্চ স্তরে উন্নীত সদস্য হিসেবে দেখতে চান।** "তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" বলার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের দোষমুক্ত হওয়ার উল্লেখ করেন। "আমাদের জামাতের মধ্যে কেউ যদি বিরুদ্ধবাদীদের গালিগালাজ ও কঠোর আচরণে ধৈর্য ধারণ করতে না পারে তাহলে তার এখতিয়ার আছে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণে চেষ্টা করার। এ বাক্যটি থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা ও কটুভাষা-জনিত অজুহাতকে বুঝায় না। কেননা সে-ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকারের চেষ্টা সে কী ক'রে করতে পারে? অতএব, সুস্পষ্ট যে, তার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। আর ব্যক্তিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করার উচ্চমানের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। যদি সে তার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, তাহলে অবধারিতভাবে তার বিবেক-বুদ্ধি সতেজ হবে এবং সে ঐ মা'রেফত লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হবে, যে-সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সবিশেষ আলোকপাত করছেন। মোটকথা, আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো যে, বাধ্যতামূলক যে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা হলো ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করার। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কঠোর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন তা কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণের দরুন ছিল না। ও সবগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর অশ্লীল আক্রমণের বিরুদ্ধে। সে-ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রশ্ন বা উপায়ই ছিল না। বলেছেন, "আদালতের মাধ্যমে প্রতিকারের চেষ্টা গ্রহণ করার তার অধিকার আছে। কিন্তু তা করা সমীচীন নয়। তার জন্য বিধেয় নয় যে, কঠোর আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে কোন দাঙ্গা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটায়।" (সুতরাং) বহু আদালত কার্যক্রম, যা আমার জ্ঞানগোচর হয়েছে, যা বিভিন্ন জামাতে সংঘটিত হতে থাকে তা উক্ত বিষয়-বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম না করার অথবা হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও তা কার্যকরী না করার ফলশ্রুতিতে উল্লেখিত বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "ইহা তো সেই উপদেশ যা আমি আমার জামাতকে প্রদান করেছি। আমরা ওরূপ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাকে আমরা আমাদের জামাত থেকে বহিষ্কার করি, যে উক্ত নীতি মেনে চলে না।" এক দিকে তার মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণ করেছেন, তা-ও স্পষ্টতঃ বলে দিয়েছেন, কিন্তু এই শিক্ষা শ্রবণের পরও সে যদি প্রতিশোধ বা প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে তিনি তাঁর সেই জামাত থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন, যে উচ্চস্তরের জামাত স্থাপনের আকাঙ্খা পোষণ করেন। যা উন্নত মানের মুখলেসীন-নিষ্ঠাবানদের জামাত, যারা প্রকৃত ও যথার্থ রূপে তাঁর আজ্ঞানুবর্তী। যদি সে ঐ শ্রেণীভুক্ত হতে চায় তাহলে ওরূপ হতে পারবে না। অধিকার প্রয়োগ করলে সে তা করতে পারে, কিন্তু ওরূপ ব্যক্তির প্রতি তিনি (আঃ) অসন্তুষ্ট-তাকে তিনি তাঁর জামাত থেকে বহিষ্কার করেন। এখন 'বহিষ্কার করণে'র বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য। কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ওরূপ লোকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে (তাঁর) জামাত থেকে বহিষ্কার করেন নি। সেজন্য আজ কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, 'অমুক ব্যক্তি এই করে, তমুক ব্যক্তি এই করে কিন্তু আপনি তাদেরকে জামাত থেকে বহিষ্কার করার ঘোষণা করেন নি।" প্রশ্ন হচ্ছে, কখনই বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ওরূপ লোকদেরকে জামাত থেকে

বহিষ্কার করার ঘোষণা করেছিলেন? অতএব, এই বহিষ্কৃত হবার বিষয়টি হচ্ছে আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক বহিষ্কার। ইহা বহিষ্কার করার কোন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম নয়। কেননা, ওরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোনও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে, তাঁর বহু রচনায় জামাতে ওরূপ ব্যক্তিদের অবস্থানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, যারা ঐরূপ বেহুদা কার্যকলাপ করে থাকে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মনঃকষ্টের কারণ হয়– তাদেরকে জামাত থেকে বহিষ্কার করার কোন দৃষ্টান্ত নেই-এর কী অর্থ দাঁড়ায়? তা ঐ যা আমি বর্ণনা করছি– কার্যতঃ (প্রকৃতপক্ষে) তারা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জামাত বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। এবং ইহা নিঃসন্দেহে অনেক বড় ধরনের ক্ষতিকর এক আশঙ্কা। মানুষ যদি তা উপলব্ধি করে সচেতন হয় তাহলে অবধারিতভাবে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। তা করলে সে অবধারিতভাবে ইহকালে এবং পরকালে 'ফালাহ্' (সফলতা) লাভ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি আল্ হাকাম ৩২তম খণ্ড, তাং ১০মে, ১৯০৮ ইং ৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তাতে তিনি বলেনঃ "ফালাহ্ সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে তার আত্মায় পূর্ণ পবিত্রতা এবং তাকওয়া-তাহারত সৃষ্টি করবে।" অতএব, তারা ছিল এই মুফলেহীন (–সফলতা লাভকারী), মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আগে যাদের উল্লেখ করছিলেন এই বলে যে, তাঁরা আমাদের জামাতভুক্ত নয়, তবে জামাতের মধ্যে যাদেরকে তিনি মুফ্লেহীনের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হতে দেখতে চান। তাদের সেই কাম্য অবস্থার বিবরণ এই যে, "তারা যেন নিজেদের মধ্যে পূর্ণ পবিত্রতা ও তাকওয়া-তাহারত সৃষ্টি করে এবং গোনাহ্ ও অবাধ্যতা যেন আর কখনও তাদের মাঝে পুনর্ঘটিত না হয়। এবং 'পাপ বর্জন' অর্থাৎ খারাপ কাজ পরিহার করা এবং 'পুণ্য-অর্জন'-অর্থাৎ পরিশ্রম ও সাধনা করে নেক কাজ আয়ত্ত করা– এ উভয় স্তর যেন সে অতিক্রম করে, তবেই কিনা খোদাকে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়।" লক্ষ্য করুন, যে বিষয়টি প্রারম্ভে সহজ বলে মনে হচ্ছিল, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উহা কতই না কঠিন। সুতরাং তিনি বলেন, "ঈমান কোন সহজ একটি বিষয় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না (এক্ষেত্রে) মানুষ (একপ্রকার) মৃত্যুবরণ করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কী করে সম্ভব যে, সত্যিকার ঈমান সে লাভ করতে পারে?" 'মৃত্যুবরণ করে নেয়'– কথাটি দ্বারা পূর্ববর্তী- বাক্যসমূহের আলোকে এই বুঝায় যে, **মানুষ যেন তার সব রকম ক্রোধ ও আবেগ-উত্তেজনাকে দমন করে প্রত্যেক প্রকার পাপ পরিহার করে এবং পুণ্য অর্জন করে, আর জাগতিক দিক দিয়েও যেন নিজের উপর এক মৃত্যু আনয়ন করে। সেই মৃত্যুর পর তার মধ্য দিয়ে যেন এক নতুন সত্তার উদ্ভব হয়-এই দুনিয়াতে বাস করেও যেন সে অন্য কোন জগতে জীবিত থাকে।** এই সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মৃত্যু বরণ করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কী করে সম্ভব যে, সত্যিকার ঈমান সে লাভ করতে পারে?

আরেকটি উদ্ধৃতি 'বদর' ৭ম খণ্ড, সংখ্যা নং ১৯, পৃঃ ৫-৬ তাং ২৪ মে, ১৯০৮ ইং থেকে নেওয়া হয়েছে। বলছেন : "যখন মানুষ একমাত্র আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে নিজের ভাবাবেগকে দমন করে, তখন এর ফলশ্রুতিতে রয়েছে দীন ও দুনিয়াতে সফলতা, সম্মান ও মর্যাদালাভ। 'ফালাহ্' বা সফলতা দুই প্রকারের। নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করাতে পরকালেও নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ হয় এবং দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি পাওয়া যায়।" ইহা তো এরূপ একটি সত্য যা মানুষ তার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে পরখ করে দেখতে পারে। যখনই মানুষ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর (সম্ভবনার) সম্মুখীন হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া-যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তাআলারই আশ্রয়স্থল,-অন্য কোনও আশ্রয়ের সৌভাগ্য সে লাভ করতে পারে না। **যখনই সে ব্যাপারাদিতে নিষ্পত্তি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় তখন সে গুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তার তালাশ করে দেখা উচিত যে, ওরূপ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কী নির্দেশ দান করেন। ঐ নির্দেশনাই তার হিফাযত করবে।** আর যদি দুঃখ স্পর্শও করে তবুও উহার কুপ্রভাব নিরসনার্থেও তাঁরই (সাঃ) শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। গতকাল টেলিফোনে একজন বল্লেন, "আমার প্রিয় ভাই মারা গেছেন, ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন। তাছাড়া আমার অমুক-অমুক নিকট আত্মীয়ও মারা গেছেন। এখন আমি কী করি?" তাঁকে আমি একথাই বল্লাম, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হেদায়াতসমূহের আশ্রয়ে এসে যান। কেননা, এই আঘাত প্রশমনের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলাহ্ (সাঃ)-এর আদর্শের দিকে ধ্যান না যায়, তা প্রশমিত হতে পারে না। বরং এ আঘাত আপনারই জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পরলোকগতদের আপনি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবার পরিবর্তে আপনাকেই সেখানে চলে যেতে হবে, যেখানে পৌঁছে গিয়ে তারা খুশীই আছে। কিন্তু আপনি খুশী হতে পারবেন না। কেননা, আপনি যে আচরণ অবলম্বন করে রেখেছেন তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।" অসংখ্য মর্মাঘাত তাঁকে (সাঃ) স্পর্শ করেছে। প্রত্যেক আঘাতের বেলাতেই তিনি (সাঃ) আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়েছেন। আর এই আশ্রয়টি পাওয়া যায়-এই দৃঢ়বিশ্বাস থেকে যে, এই দুনিয়া অনস্থায়ী, পরজগতে আমাদের প্রস্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব, প্রত্যেক আঘাতে সত্যিকারভাবে ধৈর্যধারণ ঐ জগতে যাওয়ার মাত্র পথকেই সহজ ও সুগম করে না, বরং এই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায়ও এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন (এক উন্নত) মন-মানসিকতা দান করে। এর অর্থ এই নয় যে, একেবারে সংসার ত্যাগী হয়ে পড়ে, বরং সম্পর্কহীন **এই অর্থে যে, এই জগৎ-সংসার তার মাঝে অবস্থিত আছে বলেই সে তা অবলোকন তো করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার হৃদয়াবেগ ও ধ্যান সর্বদা আল্লাহ্র দিকেই ধাবিত হতে থাকে। মানবজাতির প্রতি তার সদ্ব্যবহারকে সে সদা অব্যহত রাখে। তাদের কাছ থেকে সে সরে পড়ে তেমনটি সে কখনও করে না। সুতরাং এই ধারাতেই রয়েছে ইহকালের সাফল্য এবং পরকালেরও।** তাই মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "ফালাহ্ (অর্থাৎ সাফল্য) দুই প্রকার। নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করাতেই পরকালেও নাজাত লাভ হয় এবং দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি পাওয়া যায়।" অতঃপর বলেন, "পাপাচার স্বয়ং এক প্রতিমাস্বরূপ। বস্তুতঃ তারা ব্যধিগ্রস্ত, যারা পাপাচারে স্বাদ (আনন্দ) পায়। পাপকাজের কখনও সুফল হয় না। কোন কোন মদ্যপায়ীকে আমি দেখেছি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে– চোখ থেকে সব সময় পানি ঝরা, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, সহসা হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে তারা মারা গেছে। অতএব, খোদাতাআলা যে পাপাচার থেকে বারণ করেন, তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। ডাক্তার

যেমন কোন রুগীকে পরহেয (-পথ্য ইত্যাদি) বলে দেন, তাতে রুগীর উপকার হয়ে থাকে, না কি ডাক্তারের?" অতএব, এই সব উপদেশই যা আপনাদের দান করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সাঃ)-এরই উপদেশাবলী আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বা উচ্চারণে শ্রবণ করে থাকেন। এ সব উপদেশ দানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যক্তিগত কোনও ফায়দা বা স্বার্থ নেই। এ সবে আপনাদেরই ফায়দা রয়েছে। এসব ব্যবস্থা-পত্রের যে-কোনটিও যদি আপনারা মেনে চলেন-আমল করেন, তাহলে আপনারাই অবশ্য উপকৃত হবেন। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসক এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণের মাঝে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ডাক্তারের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র যদি কেউ না মানে তবে ডাক্তারের কোন ক্ষতি হবে না, বরং তার নিজেরই ক্ষতি হবে। **কিন্তু খোদার প্রকৃত বান্দাগণ যারা নবুওয়তের পদমর্যাদায় আসীন হয়ে থাকেন তারা অবশ্য নিজে এক প্রকার ব্যক্তিগত বা সাক্ষাৎ ক্ষতি হিসেবে অনুভব করে থাকেন, ডাক্তারের সেরূপ অনুভূতি সচরাচর হোক বা না হোক**। অতএব, জাগতিক 'ফালাহ্' (সাফল্য)-কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ এক প্রকার পানি বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, "তোমরা সবরকম নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করে চল। প্রবৃত্তি বা নফ্সকে লাগামহীন ছেড়ে দিও না যাতে এমন না হয় যে, তোমাদের উপর আযাব নেমে আসে।" নফ্সের বল্গাহীনতার দরুন নানা ধরনের দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন আগেই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য হানিকর সব রকম অভ্যাসকে যদি খোলা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তদজনিত কুফলের দরুন আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। "আল্লাহ্তাআলা অপার অনুগ্রহপূর্বক সকল প্রকার দুঃখ এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সকল পথ বলে দিয়েছেন। এরপরও যদি কেউ ঐসব দুঃখদায়ক পাপকাজ পরিহার করে না চলে, তাহলে ইসলামের উপর অভিযোগ আসতে পারে না।"

অতঃপর 'বদর' ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭ তাং ২৬ জুলাই, ১৯০৪ইং এই উপদেশ দান করেন যে, "মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্য হয়ে থাকে, যখন সে বিপৎপাতের পূর্বেই নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি কেউ (আধ্যাত্মিক) পরিবর্তন সৃষ্টি না করে আর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে জাগতিক উপায়-উপকরণ এবং ফন্দি-ফিকিরের উপর, তাহলে তার ক্ষেত্রে পরিবার সুদ্ধ নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কী বা হতে পারে?" এখন এই কথাগুলো সযত্নে দৃষ্টিগোচর রাখুন। কেননা, কোন কোন ব্যাপার ঘর সুদ্ধ ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। বলেছেন, বিপদ আসার আগেই যেন সে নিজের ভেতর পরিবর্তন সৃষ্টি করে নেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের নফ্সের খারাপিগুলি থেকে তওবা করে না এবং অবদমিত প্রবৃত্তির কদর্যগুলিকে লুকোবার চেষ্টা করে-প্রকৃতপক্ষে তার নফ্সই তার চারপাশে সংকট ও আশঙ্কাবলী সৃষ্টির কারণ হয়। যদি কেউ মনে করে যে, চালাকি-চাতুর্য অবলম্বনের দ্বারা তার নফ্সের খারাপিগুলি ভেতরেই চাপা পড়ে যাবে এবং বাইরে প্রভাব বিস্তার করবে না তাহলে এটাই হচ্ছে ফিকির-ফন্দি এঁটে বাঁচার চেষ্টা। ওরূপ চেষ্টায় তার কোনও ফায়দা হবে না। কেননা, এইসব অনিষ্টকর বিষয়ের দরুন সে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যেহেতু সে চোখ বুঝে বসে আছে সেজন্য তার গৃহে যারাই বসবাস করে তারাও তার ক্ষতির অংশ পাবে।" সুতরাং কতক লোক নিজের সম্পর্কে পরোয়া না করলেও স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে। তাদের বরাত দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "তার গৃহে বসবাসকারী সবাই তার ক্ষতির আওতায় পড়বে। কেননা, নৌকার মাঝির মত পুরুষ তার গৃহের তত্ত্বাবধায়ক বা দায়িত্ববান হয়ে থাকে। যদি সে ডুবে যায় তাহলে তার সাথে নৌকাও ডুবে যাবে। সেজন্যই বলা হয়েছে, "আর রিজালূ কাওয়ামূনা আলান-নিসা" অর্থাৎ পুরুষ নারীদের উপর 'কাওওয়াম'স্বরূপ হয়ে থাকে- তাদেরকে সোজা সঠিক রাখার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এরূপ শক্তি-সামর্থ্য ক্ষমতাসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলোর সদ্ব্যহারের দ্বারা তারা সরল সঠিক পথে নিজেরা পরিচালিত হলে নিজেদের পরিবারকে সরল সঠিক পথে চালাতে পারে। তার নিজের কল্যাণ ও উদ্ধার প্রাপ্তির মাঝে তার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। যদি আল্লাহ্তাআলা তার জন্য কল্যাণের উপায় সৃষ্টি না করেন, তাহলে তার পরিবার-পরিজনের কল্যাণের উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হতে পারে না। "ওয়া লা-ইয়া খাফু উক্বাহা" (-এবং তিনি তাদের পরিণাম সম্বন্ধে কোন পরওয়াই করলেন না) -আয়াতটিতে স্পষ্ট হয় যে, খোদাতাআলা তাদের পশ্চাৎবর্তীদের ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। তখন তাঁর বেনিয়াযী (অবজ্ঞাসূচক রুদ্ররোষ) কার্যকর হয়। 'লা-ইয়াখাফু উক্বাহা'-তে বলা হয়েছে যে, খোদাতাআলা তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে কোন পরোয়া করেন না। যারা এ আয়াতটির পূর্বাপর বিষয় জানেন তারা এটাও জানেন যে, 'লা-ইয়াখাফু উক্বাহা' ঐ সকল প্রবৃত্তির অধিকারী লোকের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও নফ্সকে ভেতরে চেপে দিয়ে এরূপে পাপাচারে লিপ্ত হয় যে, তার ভেতরকার কোনও কদর্য যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। অথচ নফ্সকে যত ইচ্ছা তারা চেপে দিক না কেন, উহার ভাল-মন্দ উভয়ই বাইরে বেরিয়ে আসে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'লা ইয়াখাফু উক্বাহা' আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত দান করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, যারা তাদের কুমতলব, বিদ্বেষ ও কদর্যকে নিজেদের ভেতরে চেপে রেখে এগুলোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না। সেই অনিষ্ট অবশ্যই ছড়াবে এবং তাদের ক্ষতির কারণ হবে।

আল-হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা ৩৯, পৃঃ১০, তাং ২৬ অক্টোবর ১৯০২ ইং থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি হচ্ছেঃ "আল্লাহ্তাআলা তাঁর বিশেষ একটি কানুন তাঁর মনোনীত ও সত্যপরায়ণ বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উহা এরূপ একটি টিকা যার জন্য কোন ছেদন-যন্ত্রেরও সাহায্য লাগে না এবং তাতে জ্বরও আসে না। যখন তাদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর দুষ্কৃতি পূর্ণ আকার ধারণ করে তখন তাঁরা তদ্বারা খোদার ছায়ার নীচে এসে যান। তোমরা সেই টিকা গ্রহণ কর, যাতে তোমরা বিনষ্ট না হও। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজে তা হৃদয়ঙ্গম করেছে সে যেন অন্যকেও বুঝিয়ে দেয়।" এখন, মহামারি ও অন্যান্য আপদ থেকে রক্ষার জন্য টিকার ব্যবস্থা ও প্রচলন রয়েছে। এবং টিকা স্বয়ং সচরাচর কষ্টকর, এমনকি ক্ষতিকরও হয়ে থাকে। ছেদন করা হয়, সেজন্য মানুষ কষ্ট বোধ করে। তারপর জ্বর হয়ে যায়। যেমন, বসন্তরোগের টিকাতে ওরূপ কষ্ট হয়ে থাকে। তিনি বলছেন, "আমি এরূপ এক টিকার কথা বলছি যা তোমাদের কোনও কষ্টের কারণ হবে না-ছেদাও হবে না এবং জ্বরও আসবে না- তোমরা তা অবলম্বণ

কর যাতে তোমরা বিনষ্ট না হও। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে ইহা উপলব্ধি করে সে যেন অপরকে বুঝিয়ে দেয় এবং উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে জানিয়ে দেয়, যাতে কেউ-ই যেন ধোঁকাগ্রস্ত না হয়।" ইহা সেই উপদেশ, যা এখন আমাদের সাধারণভাবে (সর্বত্র) বিস্তার দেওয়া দরকার। (ইহা ব্যাখ্যা করে) তিনি বলেন, **"কেবল (বয়াতের খাতায়) নাম লেখালেই কেউ জামাতভুক্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শিক্ষার মূল-তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে। পরস্পর একে অপরকে ভালোবাসো। কোনরূপ অধিকার হরণ করো না এবং খোদার পথে উন্মাদ বা আত্মহারা হয়ে যাও, যাতে খোদা তোমাদের উপর দয়া ও আশিস বর্ষিত করেন। তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত কোনও কিছুই নেই।"** যে টিকার কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই টিকা। এর সম্পর্কেই বলেছেন যে, তোমাদের নাম যদি আমার জামাতের মধ্যে লিখা হয় তাহলে ওটা হচ্ছে নাম-লিখন মাত্র যেমন, বয়াত-ফরমে নাম লেখা হয় অথবা জামাতের আদমশুমারির তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এটুকুতেই কেউ তাঁর জামাতভুক্ত হয় না। ওরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল, ওরূপ নাম লেখানোর কোন মূল্য নেই। **নাম লিখানোর পর আহ্‌মদীয়া জামাতের যে মূলতত্ত্ব হযরত মসীহ্ মাওউদ-বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তা যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নাম লেখার কোন দাম ও সার্থকতা নেই। সেই মূল-তত্ত্ব হচ্ছে যে, "তোমরা পরস্পর একে অপরকে ভালবাসো, একে অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করো না।"** উক্ত দুটি কথা একই বিষয়ের দু'টি দিক। (কেননা) যাকে আপনারা ভালবাসেন তার অধিকার হরণ তো করতে পারেন না। মায়েদের কি কখনও সন্তানের অধিকার হরণ করতে দেখেছেন? অজ্ঞ-মুর্খই হবে এমন মা, যে সন্তানের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খেয়ে ফেলে! সন্তানের খাবার সন্তানকে দেয় শুধু তাই নয় বরং নিজেরটাও মুখে না দিয়ে সন্তানের মুখে তুলে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, 'ভালবাসো এবং অধিকার হরণ করো না"। (এর অর্থ এটাই যে,) ভালোবাসার পরিচয় ও প্রমাণ-ই হবে এভাবে যে, তোমরা কারও অধিকার যেন আত্মসাৎ না কর। আর যখন অধিকার আত্মসাৎ করবে না, তখন নিজেদের অধিকার অপরের পক্ষে ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। **অধিকার হরণ না করা হচ্ছে ভালোবাসার প্রথম দাবী ও চাহিদা। কিন্তু নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়া হলো ভালোবাসার দ্বিতীয় দাবী ও চাহিদা।** অতএব উভয় দিক দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ নির্দেশটি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন। অর্থাৎ, অন্যের অধিকার কখনও হরণ করো না। বরং তাদের খাতিরে নিজেদের হক ও অধিকার ত্যাগ কর। এটা তো (আপাতঃদৃষ্টিতে) উন্মাদনা (বলে প্রতীয়মান হয়)। অন্যের হক যেন নষ্ট না করো-এটা তো সঠিক কথা কিন্তু নিজের হক্ কেন নষ্ট করবে।? তা এজন্যই বলেছেন যে, "খোদার পথে উন্মাদবৎ হয়ে যাও অর্থাৎ তবেই কিনা সম্ভব যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার দরুন আপনারা উন্মাদের মতো হয়ে যান। বাহ্যতঃ এগুলো উন্মাদসুলভ কথাই বটে। (কিন্তু যেমন) সন্তানের সঙ্গে মায়ের এক ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে যা সে উপেক্ষা করতে পারে না, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থাই বটে। তাই তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার পথে উন্মাদের মত হয়ে না যাও, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুরূপ মাতৃসুলভ সম্পর্ক সমগ্র মানব জাতির সাথে স্থাপন করা সম্ভব নয়, যাতে খোদাতাআলা তোমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করেন। কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।" এখন, আমাদের তরবীয়তের লক্ষ্যে ইহা এক মহান কর্মসূচী যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর সূক্ষ্ম পথগুলোও আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের বার বার নসীহত করছি যে, **তোমরা পাক-সাফ হয়ে যাও যেরূপ সাহাবা কেরাম নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেছিলেন। তারা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন, যেন (দরবেশসুলভ) ছালার বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। অনুরূপ পরিবর্তন তোমরা নিজেদের মধ্যে আনয়ন কর।"** এক্ষেত্রে এ কথা বলেন নি যে, সংসারত্যাগী হয়ে তাঁরা ছালার বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। কেননা, সাহাবাদের মধ্যে অত্যন্ত (দামীও) সুদৃশ্য পোষাকধারী সাহাবার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। স্বয়ং হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুদৃশ্য পোষাক পরিধানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময় বাইরে থেকে অত্যন্ত মনোরম দামী পোষাক উপঢৌকনস্বরূপ তাঁকে পেশ করা হয়। তা তিনি পরিধান করেন। এটাও শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ধরন, যেমন আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের বারিবর্ষণের প্রথম ফোটাটি তিনি তাঁর জিহ্বার ডগায় গ্রহণ করতেন। অনুরূপ ঐশী-প্রেমেরই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "সাহাবারা যেন ছালার বস্ত্র পরে নিয়েছিলেন।" এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খোদা-অন্বেষার পথে যদি দারিদ্রের দরুন ছালার বস্ত্র পরিধান করতে হয় এবং দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে যায়- রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে, আর কার্যতঃ ছালাই পরিধান করতে হয়, তবুও এর কোনও পরোয়া করবেন না। ছালা পরিধানের জন্য নিজেরা মানসিকভাবে রিষ্টচিত্তে প্রস্তুত থাকা-এই বিষয়-বস্তুই এখানে বর্ণিত হচ্ছে। যদি আপনারা অনুরূপ ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করেন তাহলে যেন ছালা পরিধান করে নিলেন বলেই আপনারা বিবেচিত হবেন। যে কুরবানী আপনাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি, কিন্তু সে জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত আছেন খোদার দৃষ্টিতে তা এমনই, যেমন ঘটে গেছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বান্দদের সাথে আল্লাহ্‌র অনুরূপ ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি আহ্‌বান করে থাকেন, বিভিন্ন কুরবানী পেশ করার জন্য, ওগুলোর মধ্যে কোন্‌টি কঠিন হয়ে থাকে আবার কোন্‌টি নরমও থাকে, কিন্তু যারা মানসিকভাবে তা বরণ ও পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়, তারা আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলেই লিখিত (ও গণ্য) হয় যে, তারা যেন কার্যতঃ সেগুলো পূরণ করে দিয়েছে। সুতরাং 'ছালা পরিধান' সংক্রান্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য স্যুট এবং গাউন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো খুলে ফেলে দেন এবং ছালা পরতে আরম্ভ করেন। তবে তদ্রূপ সংকল্প রাখুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। এক্ষেত্রে নিয়্যত যেন সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র থাকে এই বলে যে, "খোদার কসম! যদি তাঁর খাতিরে আমাদেরকে এই সুদৃশ্য পোষাক আগুনে নিক্ষেপ করতে হয় তবে তাই করবো। গা ঢাকতে হয়, তা ছালা দিয়ে ঢেকে নেব। খোদাতাআলার সন্তুষ্টিকে কখনও উপেক্ষা করবো না।" ক্ষুদ্র একটি বাক্যের মধ্যে এই সমগ্র বিষয়-বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

এবার কোন্ এবং কীরূপ খোদার উদ্দেশ্যে এই সকল কুরবানী?–যাঁকে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় কখনও নাগাল পেতে পারে না, যিনি দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছেন। বস্তুতঃ অদৃশ্য সত্তার উদ্দেশ্যে দৃশ্যমান সত্তার পক্ষে কুরবানী পেশ করা অনেক বড়ো ব্যাপার। সাধারণতঃ মানুষ হাযিরের জন্য গায়েবকে ত্যাগ করে থাকে, কিন্তু গায়েবের জন্য হাযিরকে ত্যাগ করে না। তাই এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্তাআলার গায়েব (অদৃশ্য) হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাযির (দৃশ্যমান ও সুমুপস্থিত) হবার বিষয়-বস্তু বর্ণনা করছেন।

"কার উদ্দেশ্যে তোমরা এ সকল (কুরবানীমূলক) কাজ করবে? সেই খোদার উদ্দেশ্যে, যিনি চোখের অন্তরালে অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান, যাঁর জালাল ও প্রতাপে ফিরিশতারাও ভীত-ত্রস্ত। তিনি ঔদ্ধত্য ও চাতুর্যকে পসন্দ করেন না। ভয়-ভক্তি পোষণকারীদের তিনি পসন্দ করেন। কাজেই প্রত্যেকটি কথা ও কাজ তোমরা ভেবে-চিন্তে ও বুঝে-শুনে বলো এবং কারো। তোমরা তাঁর জামাত (-ভুক্ত), যাদেরকে পুণ্যের দৃষ্টান্ত ও নমুনা দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি বেছে নিয়েছেন- ('তাঁর জামাত' বলতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতকে বুঝায়) "যাদেরকে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা) নেকীর আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছেন। অতএব, **যে ব্যক্তি পাপ পরিহার করে না এবং তার মুখ মিথ্যাকথন ও তার অন্তঃকরণ সব রকম অপবিত্রতা-মুক্ত নয়, সে এই জামাত হতে কাটা পড়বে।**" কাটা পড়ার বিষয়ে আমি পূর্বে তাঁর একটি উদ্ধৃতি পেশ করেছি এই বলে যে, 'এরূপ ব্যক্তি আমার জামাতভুক্ত নয়।' কিন্তু কতিপয় এরূপ লোক আছেন, যারা ঐ আওতার মধ্যে পড়েন যাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তিত হতে তো দেখা যায় না এবং জামাতীভাবে কোন (আনুষ্ঠানিক) কার্যক্রম তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়ে থাকে না, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ সতর্কীকরণ নিশ্চয়ই তাদের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে যে, তারা ক্রমে ক্রমে দূরে সরতে সরতে কার্যতঃ জামাত থেকে কর্তিত হয় অথবা নিজেরাই নিজেদেরকে জামাত থেকে ছিন্ন করে নেয়। ইহা এরূপ এক নিত্য নৈমিত্তিক ধারা যে, প্রত্যেক দিনই এরূপ লোকদের বিষয়ে খবর আসতে থাকে যে, তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রথম পর্যায়ের শিক্ষাগত চাহিদাসমূহকে উপেক্ষা করেছেন। ফলে, সতর্কীকরণ ও পরিণতিমূলক তাঁর কথাগুলো অবধারিতভাবে তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবে পূর্ণতালাভ করে। তিনি বলেন, "হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন কর।" **হৃদয় বা অন্তঃকরণই হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উৎসস্থল। এখানে যদি ঝাড়ু দেয়া হয় সবরকম নোংরামি দূর করার উদ্দেশ্যে, তাহলে পবিত্র-পরিশ্রুত হৃদয় উদভাসিত হবে, যেখানে সদ্গুণাবলী এসে একত্রিত হবে এবং অবস্থান নিবে।**

সুতরাং এ কথাটি আমি বার বার উচ্চারণ করছি এবং করে চলেছি। কাজেই একথাটি প্রত্যেকের বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু শব্দগতভাবে বোধগম্য হলেও কার্যতঃ কোনও তার প্রমাণ মেলে না। মিললেও তা খুবই অল্পপরিমাণের হয়ে থাকে। সেজন্য আমাকে এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে দিন। পুনরাবৃত্তি করাতে কখনও তো কারও এদিকে খেয়াল জাগ্রত হবে এই বলে যে, সে শ্রবণ তো করে বটে কিন্তু আমল ও অনুশীলন করে না। সেজন্য এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে উপকার আছে। "ফা-যাক্কের ইন্ নাফায়া তিয্যিক্রা" (বার বার স্মরণ করাতে থাক, কেননা, তাতে উপকার হয়-অনুবাদক) আয়াতটিতে উক্ত বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তিনি (আঃ) বলেছেন, "হে খোদার বান্দাগণ! হৃদয়পট পবিত্র-পরিচ্ছন্ন কর এবং নিজেদের অভ্যন্তরকে ধুয়ে ফেলো।" যেমন সচরাচর কোন কোন মেয়েলোকের বাতিক থাকে, সব সময় তারা ঘরের ভেতরটায় ধোয়া-মুছা করতে থাকে, কিন্তু নিজেদের অভ্যন্তরে (অন্তঃকরণ) ধোয়া-মূছা করেন না। অতএব, তিনি বলেন, "নিজেদের অন্তঃকরণ ধুয়ে-মুছে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন কর। তোমরা মুনাফেকি ও দ্বৈততার দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারলেও খোদাকে পার না।" **লোক দেখানোর জীবন, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা এবং অভ্যন্তরভাগ বিস্মৃত হওয়া-এর দ্বারা হয়তো তোমরা প্রত্যেককেই রাযি করতে পারবে, তাতে সে তোমাদেরকে ও তোমাদের গৃহকে স্বচ্ছ বলেই দেখতে পাবে। ওরূপ সবাইকে দেখাতে পারবে, কিন্তু খোদাতাআলাকে পারবে না।** খোদাকে বরং এই স্বভাবের দ্বারা তোমরা রাগান্বিত করবে। এক দিকে দুনিয়া (অন্য সবাই) দেখে আনন্দ প্রকাশ করছে এই বলে যে, 'আহা! কতো চমৎকার এই ব্যক্তি অথবা এই যে-লোকটি! কতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরা! যা এই (বাহ্যিক) পরিচ্ছন্নতা দুনিয়াতে প্রশংসা কুড়োবার কারণ হচ্ছে, সে-টাই অন্য দিকে খোদতাআলার ক্রোধ উত্তেজিত করার কারণ ঘটাচ্ছে। তাই তিনি বলেন, "খোদাকে এই স্বভাবের দরুন রাগান্বিত করবে। অতএব নিজেদের প্রাণের প্রতি সদয় হও এবং বংশধরদের ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা কর। কখনও সম্ভব নয় যে, খোদা তোমাদের প্রতি রাযী হন এমতাবস্থায় যে, তিনি অপেক্ষা অন্য কেউ তোমাদের অন্তরে প্রিয়তর হয়ে থাকে।" সেই ছালা পরিধান সংক্রান্ত বিষয়– এই বলে যে, যদি অন্য কেউ তোমাদের অন্তরে প্রিয়তর হয়, তাহলে যখনই কোন পরীক্ষায় পতিত হবে, তখন সেই 'প্রিয়তর' খোদার উপর প্রাধান্য পেয়ে যাবে। উক্ত বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, তোমাদের অন্তরে যদি অন্য কোনও প্রিয় থাকে। কেননা, অসংখ্য প্রিয়জন থাকবে। কিন্তু যদি খোদাতাআলার মোকাবেলায় প্রিয়তর হয় তাহলে খোদার দৃষ্টিতে তোমরা প্রিয় হতে পারবে না। "তাঁর পথে তোমরা উৎসর্গীকৃত হও এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মবিলীন হও। (তন-মন-ধন দিয়ে) সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও।" শেষোক্ত বাক্যগুলোতে ঐশী-প্রেমের স্তরসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর একটি সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে। ইহা এদিক দিয়ে কৌতুহলপূর্ণ যে, অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগত একজন পর্যটকের সঙ্গে চলার পথে কথা বল্তে বল্তে তাকে উপদেশাবলী দান করা হচ্ছে। প্রাতঃভ্রমণের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন রওনা হলেন তখন সেই অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকও তাঁর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলো। তাকে হয়তো আগেই ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভ্রমণকালে তার সাথে যে কথোপোকথন হয় তা অন্যান্য ভ্রমণসাথীদের মধ্যে কোন কোন সাহাবী লিপিবদ্ধ করে নিলেন। ঐ কথোপোকথন নিম্নরূপঃ অর্থাৎ ঐ অস্ট্রেলিয়ানকে লক্ষ্য করে বলেন- "দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি কোন হাকিম (বিচারক)-এর সামনে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁর (-হাকিমের) কিছু আসবাবপত্র এলোমেলোভাবে যত্র-তত্র পড়ে থাকে, এমতাবস্থায় সে (দণ্ডায়মান ব্যক্তি) সেখান থেকে তাঁর সম্মুখে কোন জিনিস চুরি করার সাহস পাবে না, যদিও তার হৃদয়ে চুরির জন্য যতই প্ররোচনার উদ্রেক হোক না কেন।" অর্থাৎ যদি মালিক সামনে উপস্থিত থাকে এবং তার জিনিসপত্র বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়ে থাকে– একথাটি সাধারণতঃ

পর্যটকদের বেলায় প্রযোজ্য হবার মত কথাই বটে। কেননা, কারো গৃহে তো আসবাবপত্র ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় থাকে না। যে-ব্যক্তি দৈনিক সফরের উদ্দেশে বের হয় অথবা যে সফর থেকে ফিরে এসেছে –ওরূপ পর্যটককে লক্ষ্য করে এ কথাগুলো সত্যিই সুন্দর ও সমীচীন এবং তার অবস্থার উপর হুবহু প্রযোজ্য, যা সে নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। 'জিনিস-পত্র যদি বিক্ষিপ্ত অবস্থায়ও পড়ে থাকে, তাহলে তার সম্মুখ থেকে কেউ কোন জিনিস চুরি করার সাহস পাবে না, যদিও তার মনে চুরির জন্য যতই প্ররোচনার উদ্রেক হোক না কেন। আর চৌর্যবৃত্তিতে সে যতই অভ্যস্ত থাকুক না কেন।" হাকিমের দৃষ্টির সম্মুখে সে কখনও চুরি করতে সাহস পাবে না। "বরং ঐ সময় তার চুরির সকল প্রবৃত্তির উপর এক প্রকার মৃত্যুর অবস্থা আপতিত হবে।" পূর্বে যে মৃত্যুবরণের উল্লেখ করা হয়েছিল, এখানে তারই ব্যাখ্যা এসে গেল। মৃত্যু বলতে দৈহিক মৃত্যু নয় বরং এর দ্বারা এই বুঝায় যে, সর্বময় হাকিম অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টির সম্মুখে এরূপ কোন ভূমিকা গ্রহণ করো না যেন জিনিস-পত্র চুরি করছো এবং খোদাতাআলার ইচ্ছার বিপক্ষে কাজ করার ঔদ্ধত্য দেখাবার ক্ষেত্রে যেন তোমাদের উপর মৃত্যু-তুল্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন তখন যে-কোন দুষ্কৃতকারী, চোর-লুটেরা মৃতের মত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ক্ষমতাবান মালিকের চোখের সামনে কোন মাল চুরি করার মোটেই তার সাধ্য থাকে না। সুতরাং তিনি বলেন, "তার উপর এক মৃত্যু আপতিত হবে। কখনও তার সাহসে কুলোবে না। এমনি ধারায় সে চুরির অপরাধ করা থেকে নিশ্চয় রক্ষা পাবে। তেমনি অন্যান্য সব অপরাধকারী ও দুষ্কৃতিপরায়ণদের অবস্থা তো এমনই হয়ে থাকে যে, তাদেরকে শাস্তি দিতে সর্বসক্ষম মালিক রয়েছেন বলে তারা যখন জানতে পারে, তখন তাদের কুপ্রবৃত্তি চাপা পড়ে যায়।" গোনাহ্ থেকে বাঁচার এটাই হচ্ছে সত্যিকার উপায়। যদি কোন নিরীহ মেয়ে একা অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে থাকে যখন অন্য কেউ না থাকে বা না দেখে তখন সেখানে কোন দুর্ভাগা তার গায়ে হাত দেবার সাহস করতে পারে কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গে যদি কোন মযবুত দেহধারী শক্তিশালী পুরুষ থাকে যার মোকাবেলায় ঐ দুষ্টলোকের কোন তুলনাই না হয় তাহলে সে ধীরগতিতে মাথা নত করে এতো ভদ্রতার সাথে পাশ দিয়ে চলে যাবে যে, ঐ শক্তিশালী বিরাট দেহধারী ব্যক্তির মনে তার সম্পর্কে কোন সন্দেহও রেখাপাত করবে না। অত্যন্ত নিরীহ সেজে যাবে তখন সে ভিজেবিড়েলের মতো। একটি কৌতুক শুনিয়েছিলাম ছোটদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে। হয়তো কোন খুতবায় এর উল্লেখ আসে নি। সুতরাং কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি উপরতলা থেকে নীচে কিছু ময়লা ফেলেছিল। তা গিয়ে পড়লো সে-পথে চলা এক ব্যক্তির উপর। সে চিৎকার করে বলে উঠলো, "ওই হতভাগা! দেখিস্ না, কে যাচ্ছে এদিক দিয়ে। তোর এতবড়ো সাহস যে, আমার গায়ে কাদা ছুঁড়ে মেরেছিস! আয়, তোর সাহস থাকলে নীচে নেমে আয়।" উপর তলার লোকটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বিরাট দেহধারী। সে যখন তার কথা শোনামাত্র অগ্নিশর্মা হয়ে নীচে নেমে আসলো তখন তাকে দেখে সে বলতে লাগলো, "ঐ কাদা আপনি ফেলেছিলেন না? এই অধম আপনার সামনে উপস্থিত। আরও কিছু ফেলুন। আরেকটু উপভোগ করুন।" এই নিরীহ আচরণ কেবল ঐ শক্তিশালী ব্যক্তিকে দেখেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। **সুতরাং যদি কোন অক্ষম মানুষ কোন মহা ক্ষমতাবান অস্তিত্বের উপস্থিতিকে অনুভব করে তাহলে তার পাপাসক্ত মনোবৃত্তি ঠিক তেমনি স্তিমিত হয়ে পড়বে যেমন কাদায় লিপ্ত লোকটির ঔদ্ধত্য ধুলেয় মিশে গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্তাআলা তো কাদা নিক্ষেপ করেন না। আল্লাহ্তাআলা তো কৃপা বর্ষণ করেন।** মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপদেশসমূহ তো ফুলের ন্যায় অবতীর্ণ হয়। তা সত্ত্বেও যদি আপনাদের অবস্থা এই হয় যে, সেগুলোর দরুন আপনারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং নিজের মনমানসিকতায় ও আচরণে পরিবর্তন আনয়নের কোনও চেষ্টা না করেন তাহলে ওটা হবে সীমাতিরিক্ত যুলুম এবং অন্যায়। এই সব হচ্ছে ফুল, যা আপনাদেরকে কুঁড়িয়ে নিতে হবে। ঐ সব কাঁটা থেকে রক্ষা করার জন্যই হিতোপদেশসমূহ দান করা হয়। কাজেই নিজেদের কল্যাণের পথ অবলম্বন করুন। তাতে স্বয়ং আপনাদেরই মঙ্গল হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার পন্থা ইহাই যে, মানুষ খোদাতাআলার উপর সত্যিকার দৃঢ়বিশ্বাস যেন সৃষ্টি করে এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তিদানের ক্ষমতা সম্পর্কে মা'রেফত লাভ করে। এর নমুনাস্বরূপ উপাদান আল্লাহ্ আমাদের স্বভাবে নিহিত করেছেন। সেজন্য আমি সমীচীন মনে করলাম এই মূল-নীতিটি আপনার সামনে তুলে ধরি। তাতে আপনার যদি উপকার হয় তাহলে অবাক হবার কিছু নয়। (অর্থাৎ ঐ অষ্ট্রেলিয়ান পর্যটককে বলছেন, আপনার তাতে উপকার হলে তা বিস্ময়ের কিছু নয়।) আর যেহেতু আপনি ভ্রমণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে মিলিত হবার আপনার সুযোগ হতে থাকে, সেহেতু তাদের কাছেও একথাগুলো আপনি পৌঁছে দিতে পারেন বা উল্লেখ করতে পারেন।" অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মুসাফির বা ভ্রমণকারীর জিনিস-পত্র ছড়ানো-ছিটানো বিষয়ক দৃষ্টান্তমূলক একটি বিষয় উপস্থাপন করেন এবং তা থেকে উপদেশমূলক বিষয়-বস্তু নির্ণয় করেন। তারপর বলেন, "আপনি যেহেতু পর্যটক এবং প্রায়শঃ ভ্রমণ করতে থাকেন সেজন্য আমি ভাবলাম যে, আপনার সামনে একথাটি পেশ করি যাতে আপনি আগামীতে দুনিয়ায় যেখানেই ভ্রমণ করেন সেখানে এ উপদেশটি লোকদের মধ্যে ছড়াতে থাকেন। ইহা আমার পক্ষ থেকে একটি তোহ্ফা বিশেষ। এবং আমি অনুরূপ তোহ্ফা দিতে পারি।" বিদায় গ্রহণকারীকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট তোহ্ফা আর দেয়া যেতে পারে না, যা তার পাথেয়স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বল্লেন, 'ইহা আমার পক্ষ থেকে আপনাকে একটি তোহ্ফা, এবং অনুরূপ তোহ্ফা আমি আপনাকে দিতে পারি। **প্রত্যেক ব্যক্তি যে দুনিয়ায় আসে তার কর্তব্য হওয়া উচিত, প্রতারণা এবং বিপদ আশঙ্কা থেকে যেন নিজেকে বাঁচায়।** সুতরাং পাপাচারের অন্তরালে রয়েছে পাপের চেয়েও মারাত্মক একটি ধোঁকা। ওটা হচ্ছে মানবহৃদয়ের গোপন অবস্থা, যা সচরাচর গোনাহ্গার ব্যক্তিরও দৃষ্টির অগোচরে থাকে। অর্থাৎ কোন গোনাহ্র বহিঃপ্রকাশ ঘটতেই পারে না– যদি কিনা গোনাহ্গার ব্যক্তির অন্তরে তা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এটা এক ধরনের ধোঁকা-এই অর্থে যে, তা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। মানুষ নির্দিষ্টভাবে তা চিহ্নিত করতে পারে না। আমি আপনাকে অবহিত করছি, আপনি তা থেকে দূরে থাকুন। এবং এটাও জানাচ্ছি যে, কী করে আত্মরক্ষা করা উচিত।" যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে সেহেতু উদ্ধৃতির এ বাক্যটিতেই প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব চিহ্ন দিয়ে রাখুন। এর ব্যাখ্যা আমি পরবর্তী খুতবায় পেশ করবো।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও সরাসরি অনূদিত)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ**, সদর মুরব্বী, ঢাকা

শমায়েল
হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)
(৩য় কিস্তি)

কপাল ও মাথাঃ

তাঁর (আঃ) কপাল সোজা, উঁচু ও প্রশস্ত ছিলো। আর উচ্চ মার্গের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁর কপাল থেকে ঝরে পড়তো। ইলমে ক্বিয়াফাহ্ (আকৃতি ও চেহারা দেখে মনের ভাব ও শুভাশুভ নিরূপণকারী জ্ঞান বা শাস্ত্র) অনুযায়ী এমন কপাল যা উন্নত গুণাবলী ও চরিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যা খাড়া আগেও বেড়ে যায় নি বা পেছনের দিকেও ঝুঁকে যায় নি এবং উচ্চ অর্থাৎ উঁচু ও বিস্তৃত এবং প্রশস্ত। কতক কপাল যদিও বা উঁচু হয় কিন্তু মাথার প্রশস্ততা খুবই কম। তাঁর মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছিলো এবং এ বৈশিষ্ট্যও ছিল যে, কপালের ভাজ খুব কমই পড়তো। তাঁর মাথা বড় ছিলো। সৌন্দর্যমণ্ডিত বড় ছিলো। ইলমে ক্বিয়াফাহ্-এর আলোকে সব দিক থেকে পূর্ণ ছিলো অর্থাৎ লম্বাও ছিলো, চওড়াও ছিলো। উঁচু ছিলো আর তালুর অধিকাংশ সমতল এবং পেছন দিক থেকে যথারীতি গোলাকার ছিলো।

তাঁর চুলঃ

তাঁর (আঃ) মাথার চুল ছিলো সরু, সোজা, মসৃণ, উজ্জ্বল, কোমল এবং মেহেদীর রঙ্গে রঙ্গীন। ঘন এবং বেশী ছিলো না বরং কম কম ও খুবই মোলায়েম। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিলো। তিনি না মাথা মুড়াতেন আর না খোঁচাখোঁচা বা এর কাছাকাছি ছোট করে কাটাতেন বরং এতটা লম্বা রাখতেন যেভাবে সাধারণতঃ জাপ্‌শী রাখা হয়ে থাকে। মাথায় তৈলও দিতেন– চামেলী, হেনা প্রভৃতি। তাঁর (আঃ) অভ্যাস ছিলো যে, তিনি কখনও চুল শুক্‌নো রাখতেন না।

দাড়ীঃ

তাঁর (আঃ) দাড়ী খুব ঘন ছিলো। দাড়ীর চুল ছিলো মজবুত, মোটা ও উজ্জ্বল, সরল এবং নরম। মেহেদীর রঙ্গে রঙ্গীন ছিলো। দাড়ীকে লম্বা করে দিতেন। ক্ষৌরকর্ম করার সময়ে বাড়ীতে চুল কাটিয়ে ফেলতেন অর্থাৎ অসংলগ্ন ও অসমতল দাড়ী রাখতেন না। বরং সোজা নিচের দিকে লম্বা করে রাখতেন। দাড়ীতে সর্বদা তেল মাখতেন। একবার গালে ছোট ফোড়া হওয়ার কারণে সেখানকার কিছু চুল সবটাই কেটেছিলেন এবং উহা তবররুক (কল্যাণময়) হিসেবে লোকদের নিকট এখন পর্যন্ত মজুদ আছে। মুখমন্ডলের তিন দিকেই দাড়ী ছিলো আর খুবই সুন্দর ছিলো। তাঁর দাড়ী এতটা কমও ছিলো না যে, খোঁচা খোঁচা আর না কেবল থুতনীর ওপরে ছিলো এবং এতটাও নয় যে চোখের মধ্যে চুল ঢুকে যেতো।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)
(১৮৩৫-১৯০৮)

কলপ ও মেহেদীঃ

প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি কলপ ও মেহেদী লাগাতেন। মাথা ঘুরানো অধিক হওয়ার কারণে মাথা এবং দাড়ীতে শেষ জীবন পর্যন্ত মেহেদীই লাগাতেন। কলপ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য কিছু কিছু বিলেতি কলপও ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। শেষ দিনগুলোতে মীর হামিদ শাহ্ সাহেব সিয়ালকোটি এক প্রকার কলপ তৈরী করে উপস্থাপন করতেন। তিনি তা লাগাতেন। এতে দাড়ীতে কালো রং এসেছিলো। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে সর্বদা বছরের পর বছর ধরে মেহেদী লাগানো যথেষ্ট মনে করতেন। অধিকাংশ জুমুআতে বা অন্যান্য সময়ে ও অন্য দিনেও তিনি (আঃ) ক্ষৌরকার দ্বারা এসব লাগিয়ে নিতেন।

দাড়ীর ন্যায় গোঁফের চুলও শক্ত ও বেশ মোটা এবং উজ্জ্বল ছিলো। তিনি গোঁফ কাটাতেন কিন্তু এতটা নয়, যা ওহাবীদের ন্যায় মুড়ানো বলে মনে হয়। এতটা লম্বাও নয় যে, ঠোঁটের কিনারার নীচে থাকে। তাঁর দেহের লোম কেবল সম্মুখভাগে ছিলো পিছনভাগে ছিলো না। আর কখনও কখনও বুকের ও পেটের লোম তিনি মুড়িয়ে ফেলতেন অথবা কেটে ফেলতেন। পায়ের গোড়ায় খুব কম লোমই ছিলো। যা ছিলো তা কোমল ও ছোট ছিলো। হাতের লোমও এরূপই ছিলো।

পবিত্র মুখাবয়বঃ

তাঁর মুখাবয়ব ছিলো লম্বাটে অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ লম্বা। যেহেতু বয়স ৭০ ও ৮০ এর মাঝামাঝি ছিলো তবুও চামড়া কুচকানোর নাম-নিশানাও ছিলো না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও রাগান্বিত স্বভাবের লোকদের ন্যায় কপালে ভাঁজের চিহ্নাদিও ছিলো না। তাঁর মুখাবয়বে বেদনা, চিন্তা বা দুঃখের প্রভাব দেখার পরিবর্তে দর্শকরা বেশ মুচ্‌কি হাসি ও খুশীর প্রভাবাদিই দেখতে পেতো। তাঁর (আঃ) চোখ কালো, কাল্‌চে শরবতী রং-এর মত ছিলো এবং চোখ বড় বড় ছিলো ; কিন্তু চোখের পাতা এমনভাবে তৈরী ছিলো যে, কেবল ঐ সময় যখন তিনি উহাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে খুলতেন নচেৎ উহা সর্বদা প্রাকৃতিকভাবে গায্‌যে বসর অর্থাৎ চক্ষু নীচু করার অবস্থায় থাকতো। বরং যখন বক্তৃতা

দিতেন তখনও চোখ নিচের দিকেই অবনত থাকতো। এভাবে যখন পুরুষদের বৈঠকে যেতেন তখনও অধিকাংশ সময়ে চক্ষু নিচের দিকেই থাকতো। ঘরেও যখন বসতেন তখন তিনি অধিকাংশ সময়ে ইহা বলতে পারতেন না যে, ঘরে কে কে বসে আছে। এখানে এই কথাও উল্লেখের দাবী রাখে যে, তিনি কখনও চশমা লাগান নি এবং তাঁর চোখ কখনও কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় নি। তাঁর (আঃ) চক্ষুর হেফাযতের জন্যে তাঁর সাথে খোদাতাআলার এক প্রতিশ্রুতি ছিলো যার বদৌলতে তাঁর নয়ন যুগল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগ-ব্যাধি ও ক্লান্তি থেকে নিরাপদে ছিলো। অবশ্য প্রথম রাত্রের নতুন চাঁদ, যেভাবে তিনি বলতেন, তাঁর দৃষ্টিতে আসতো না। হযরত আকদসের নাক খুব সুন্দর ও উঁচু-উন্নত ছিলো। পাতলা, সোজা, উঁচু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ –না চেপ্টা ছিলো আর না মোটা। হুযূর (আঃ)-এর কান ছিলো মাঝারী ধরনের বা এর চেয়ে একটু বড়। না বাইরে বেশী বেড়ে থাকতো আর না সবটা মাথার সাথে চেপ্টা হয়ে লেগে থাকতো। কলমজাত আমের একটি ফালির মত উপর থেকে বড় আর নিচ থেকে ছোট। শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় উত্তম ছিলো। তাঁর গন্ডদেশ কুঞ্চিত হয়ে ভেতরে ঢুকে যায় নি বা এত মোটা ছিল না যে, বাইরে বেরিয়ে আসতো। চোয়ালের হাড়ও বাইরে বের হয়ে থাকে নি। তাঁর ভ্রূযুগল পৃথক ছিলো জোড়-ভ্রূ ছিলো না। তাঁর কানপট্টি চওড়া ছিলো আর ইহা তাঁর জ্ঞানের উৎকর্ষতার প্রতি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে।

ঠোঁটঃ

তাঁর ঠোঁট পাতলা ছিলো না। কিন্তু এমন মোটাও ছিলো না যে, বিশ্রী। তাঁর 'মুখের হা' মাঝারী ধরনের ছিলো এবং যখন কথা বলতেন না তখন মুখ খোলা থাকতো না। কখন কখনও যখন মজলিসে চুপ চাপ বসে থাকতেন তখন তাঁর পাগড়ীর আঁচল দ্বারা পবিত্র মুখখানা ঢেকে নিতেন তিনি।

শেষ জীবনে দাঁতগুলো কিছু খারাপ হয়ে গিয়েছিলো অর্থাৎ মাড়ির কতক দাঁতে পোকা লেগে গিয়েছিলো যাতে কখনও কখনও কষ্ট হোত। সুতরাং একবার একটি মাড়ির দাঁতের অগ্রভাগ এমন সূঁচালো হয়ে গিয়েছিলো যে, উহাতে জিহ্বায় ঘা হয়ে গিয়েছিলো তাই রেত (File) দ্বারা ঘষে উহাকে সমানও করাতে হয়েছিলো। কিন্তু কখনও কোন দাঁত উঠান নি। দিনে তিনি কয়েকবার মেসওয়াক করতেন।

গরমের দিনে কখনও কখনও তাঁর পায়ের গোড়ালী ফেটে যেতো। যদিও ঠান্ডা গরমে সচরাচর গরম কাপড় পরতেন তাই গরমের সময়ে ঘাম ভালই ঝরতো। কিন্তু যতদিন পরেই কুর্তা বদলাতেন আর আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন, তাঁর ঘামে কখনও দুর্গন্ধ হয় নি।

গ্রীবাঃ

তাঁর গ্রীবা মাঝারী ধরনের লম্বা ও মোটা ছিলো। তিনি তাঁর অনুসৃত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মত তাঁর (সাঃ) অনুসরণে এক সীমা পর্যন্ত দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতেন। জুমুআর দিন গোসল, ক্ষৌর কর্ম, মেহেদী, মেসওয়াক, তেল ও সুগন্ধি, চিরুনী ও আয়নার ব্যবহার তিনি সর্বদা সঠিক রীতি অনুযায়ী করতেন। কিন্তু এসব কাজে ব্যস্ততা তাঁর পবিত্রসত্তা থেকে বহু দূরে ছিলো অর্থাৎ এতে তিনি অধিক সময় বিনষ্ট করতেন না। (চলবে)

পরিচালক–মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

জেনে রাখা ভাল

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিভিন্ন সময়ের তাহকীক (গবেষণা) ও নির্দেশ অনুযায়ী নামায সম্পর্কিত নিম্নোক্ত মসলাগুলো আমাদের জেনে রাখা ভালঃ

(১) দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়াটি নিম্নোক্তভাবে পড়তে হবে। এতদনুযায়ী পুস্তিকাদি সংশোধন করে নেয়া যেতে পারেঃ

"আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহ্দীনি, ওয়া আফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা'নী"

(২) বা-জামাত নামাযে ইমামকে সর্বোতঃ অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং কোন মুক্তাদি যদি নামাযে পরে যোগদান করেন সেক্ষেত্রে ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানো শেষ হওয়ার পূর্বে কোন মুক্তাদি দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পড়তে পারবেন না অর্থাৎ উভয় দিকে সালাম ফিরানো শেষ হলে তবে দাঁড়াবেন।

(৩) বা-জামাত নামাযে দ্বিতীয় সারি বা কাতার বানাবার জন্যে ইমামের সঠিক পেছন থেকে সারি আরম্ভ করতে হয়। পেছনে যদি কেবল মাত্র একজনই থাকেন, সামনের সারিতে জায়গা না থাকে তাহলে তিনি একাকীই সারিতে দাঁড়াবেন। সামনের সারির কাউকে টেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

পরিচালক–মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ওয়াকফে নও মোজাহেদ-এর সাথে পরিচিত হোন

(১) সুলতান মাহমুদ আনোয়ার (নং ৫৮৪৪-এ), (২) মরিয়ম সিদ্দীকা (নং ৮৩৩৭-এ)
পিতাঃ হাফেয মোহাম্মদ আবুল খায়ের (মোয়াল্লেম), মাতাঃ হামিদা খায়ের,
মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জুমুআর খুতবা

সহজ হিসাব প্রসঙ্গে

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ২০ মার্চ, ১৯৯৮ ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা ইনশিকাক-এর ৭-৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ۝
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, হে ইনসান! তোমাকে বড় কষ্ট এবং শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর হতে হবে, অতঃপর তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। 'ফা আম্মা মান্ উতিয়া কিতাবাহূ বেইয়ামিনিহী'-সুতরাং ঐ ব্যক্তি যাকে তার কিতাব ডান হাতে দেয়া হবে, 'ফা সাওফা ইউহাসাবু হিসাবাইঁ ইয়াসীরা'- তাহলে তার কাছ থেকে বড় সহজ হিসাব নেয়া হবে।

এ আয়াতগুলোতে শুভ সংবাদ ও সতর্কবাণীসমূহ রয়েছে। বড় শুভ সংবাদ এটি যে, পরিশেষে আল্লাহ্তাআলার সাথে মিলিত হবে। এ মিলন কোন্ পথে হবে? সহজ পথে না কঠিন পথে? ঐ সকল ব্যক্তি যারা খোদাতাআলার রাস্তায় কষ্ট করেন বা কষ্ট অবলম্বনকারী তাদের উভয়ের জন্য উভয় রাস্তাই খোলা রয়েছে। কঠিন পথে যেতে পারেন, আবার সহজ পথেও। এ কঠিন পথ কোন্টি আর সহজ পথ কোন্টি? এগুলোর বিস্তারিত কিছু বিবরণ আমি এখানে দিতে চাই।

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ্তাআলাকে লাভের জন্য যে চেষ্টা এবং সংগ্রাম করছে এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র সাথে তার সাক্ষাৎ তো অবশ্যই হবে কিন্তু পথের সমস্যাগুলো বাধা সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমকে নষ্ট করে দেয়। সাক্ষাতের পথে যদি শয়তানী প্রতিবন্ধকতা অনেক বড় হয়, যাকে পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা (তার পক্ষে) সম্ভব নয়। সেই ব্যক্তিও সাক্ষাৎ করবে কিন্তু তার সাক্ষাৎ সহজ হিসাবের সাথে হবে না। এ রাস্তায় অনেক ভুল এমন হবে যেগুলোকে আল্লাহ্তাআলা ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন না। ক্ষমার যোগ্য যে ভুলগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য 'হিসাবে ইয়াসীর' (সহজ হিসাব) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যে ভুলগুলো খোদাতাআলার দৃষ্টিতে ক্ষমার যোগ্য নয় তার জন্যে এ শুভ সংবাদ নয় যে, 'ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহূ বেইয়ামিনিহী'। হিসাব দুজনেরই হবে কিন্তু একটি হিসাব কষ্টকর। যেভাবে হাদীসে নব্বী অনুযায়ী বুঝা যায় যে, এমন (অর্থাৎ কষ্টকর) হিসাবে তাদের খাতা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা হবে। প্রত্যেক ভুল-ভ্রান্তিকে বের করে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। এমন হিসাবের অভিজ্ঞতা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে হয়েই থাকে। অনেকে এমন হাকিমের সম্মুখীন হয় যাঁরা সিদ্ধান্ত করে বসে থাকেন যে, এ ব্যক্তিকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে। (তখন) তার পূর্বাপর সমস্ত রেকর্ড আনিয়ে নেন, ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখেন, যেখানেই কোন ভুল কথা পান তখনই সেটাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এতে তাদের ক্রোধ এবং বদ্ধমূল ধারণা কাজ করে। তবে আল্লাহ্তাআলা যখন কোন হিসাব করেন তখন কোন ক্রোধ এবং বদ্ধমূল ধারণার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল-ভ্রান্তি এবং বড় থেকে বড় ভুল-ভ্রান্তি উভয়ই রয়েছে। এ ভুল-ভ্রান্তির উপর দৃষ্টি রেখে তিনি কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পূর্বে এ সিদ্ধান্ত করে রাখবেন যে, অমুক ব্যক্তির আমলনামা এত নোংরা এবং স্বেচ্ছায় সম্পাদিত ভুল-ভ্রান্তি যে, তাকে ক্ষমা করবো না। যেহেতু ক্ষমা করা হবে না এজন্যে হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে তার রেজিস্ট্রার নিজেই বলবে। এত বলবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তার সাথে কোন যুলুম করা হয়নি। তার সাথে যা করা হয়েছে ঠিক তাই তার আমলনামা দাবী করছিল। সুতরাং এটি হচ্ছে একটি 'কাদহান' যে পথ মানুষ অতিক্রম করে বা করবে, আর সেখানে তাকে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। তবে কোন্ কাঠিন্য বা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে সেখানে পৌঁছাবে এ সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন করীমের আরও কতক আয়াত রয়েছে যা আমি আপনাদের সম্মুখে রাখছি তা এ বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করে।

সূরা নাবায় : 'লা ইয়াস্মাওনা ফিহা লাগবাঁও ওয়ালা কিযযাবা'- জান্নাতির জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে যে, তারা সেখানে কোন বাজে কথা বা মিথ্যা কথা শুনবে না। 'যাজাআম্মির্ রব্বিকা আতায়ান হিসাবার্ রব্বিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয্' -এটি প্রতিদান তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে। উপহারে হিসাবতো হয় না, অথচ এখানে 'হিসাব' শব্দ এসেছে। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'আতাআন্ হিসাবার্ রব্বিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয্ ওয়ামা বায়নাহুমার্ রহমানি লা-ইয়ামলিকুনা মিনহু খিতাবা' -এটি এমন হিসাব যা আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং যা এর মধ্যে রয়েছে (আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে) সেগুলোর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। এ হিসাব রহমান খোদা নিবেন। 'রহমান' শব্দটি বুঝাচ্ছে যে, বড় সহজ হিসাব হবে। সহজ হিসাবের অর্থ হচ্ছে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে সেগুলো এ বান্দারা লাভ করবে। অর্থাৎ যা আমল হবে তার সাথে পুরস্কারের কোন তুলনাই হবে না। আল্লাহ্ যখন হিসাব করে থাকেন তখন এরূপ হিসাবই করে থাকেন, এরই নাম হচ্ছে 'হিসাবে ইয়াসীরা'। 'লা ইয়ামলিকুনা মিনহু খিতাবা' -তারা আল্লাহ্তাআলার সংগে কথা বলার অধিকার রাখবেন না। ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা তাদের থাকবে না। আল্লাহ্তাআলা যাকে কথা বলার অনুমতি দিবেন সেই কেবল কথা বলতে পারবে। অন্যত্র জুমুআর নামাযে তেলাওয়াতযোগ্য সূরা গাশিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, 'ইন্না ইলায়না ইয়াবাহুম সুম্মা ইন্না আলায়না হিসাবাহুম'-আমাদের দিকে তাদের

লাগাম অর্থাৎ আমাদের হাতে তাদের লাগাম। অবশ্যই তাদের আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। 'সুম্মা ইন্না আলায়না হিসাবাহুম- এ হিসাবে পুণ্যবান এবং পাপী সকলে অন্তর্ভুক্ত হবে, কেউ নেই যে হিসাব ব্যতীত থাকবে। যাদের সম্পর্কে হাদীসে হিসাববিহীন হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, সেই হিসাববিহীনের অর্থ হচ্ছে তাদের হিসাবের উপর একটি ভাসা-ভাসা দৃষ্টি দেয়া হবে এবং সামনে অগ্রসর হতে দেয়া হবে। অনেক সময় যখন আপনি এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করেন তখন পাসপোর্ট দেখে বুঝা যায় কাদের পাসপোর্ট। অফিসার হাল্কা দৃষ্টি দিয়েই কতককে বলেন আপনি যেতে পারেন। সেটিও একটি হিসাবই হয়ে থাকে। হিসাব ছাড়া কেউ যেতে পারে না। তবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাব ছাড়া যাবে যে, তার হিসাবকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা হবে না বরং সে যে জান্নাতের অধিকারী তা প্রমাণ করার জন্য (তার আমল নামায়) ভাসা-ভাসা দৃষ্টিই যথেষ্ট হবে।

'ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু ইয়ামিনিহী' অর্থাৎ যার কিতাব তার ডান হাতে দেয়া হবে' এর বর্ণনা পূর্বে চলে গিয়েছে। এখন 'শেমালিহী' যার কিতাব তার বাম হাতে দেয়া হবে। ডান হাতের অর্থ হচ্ছে পুণ্যের হাতে দেয়া হবে। ডান হাতের অর্থ হচ্ছে পুণ্যের হাত, সত্যের হাত। যাকে এমনভাবে কিতাব দেয়া হবে যা গ্রহণ করার সময় সে বুঝতে পারবে আমার হিসাব সহজ হবে। কেননা, দিনের (ধর্মের) পথে সে কিতাব পাচ্ছে। শিমাল-এর অর্থ হচ্ছে বাম হাত বা মন্দের রাস্তা। ঐসকল ব্যক্তি যাদের কিতাব দেয়া হবে তাদের একই দিক থেকে এমনভাবে কিতাব দেয়া হবে না যে, এ বিষয়টি তাদের নিকট অস্পষ্ট থাকবে। সমস্ত হাশরের ময়দান দেখবে, যে ব্যক্তিরা সম্মান পেতে যাচ্ছে তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হচ্ছে। যাদের জন্য লাঞ্ছনা নির্ধারিত তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। 'ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বেশিমালিহী' -নিশ্চিত ঐ ব্যক্তি যার বাম হাতে আমলনামা ধরানো হবে, 'ফা ইয়াকুলু ইয়া লাইতানি লাম উতিয়া কিতাবিয়া' দৃশ্য নিজেই বলে দিবে যে, আমি মৃত্যুবরণ করেছি, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে বলে দিবে যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। নির্দ্বিধায় বলে উঠবে, 'ইয়া লাইতানি লাম উতিয়া কিতাবিয়া' হায়, যদি এমন হত যে, আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেয়া হত! 'ওয়ালাম আদরিমা হিসাবিয়া' এবং আমি কখনো জানতে না পারতাম আমার হিসাব কি? 'ইয়া লায়তাহা কানাতিন কাযিয়া' হায়! পরিতাপ এটি তো একটি মিমাংসীত আমলনামা (আল্ হাক্কা' আয়াত ২৬-২৮)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেও এ দোয়া করতেন যেন তার হিসাব সহজ হয়। আর এ প্রয়োজনেই আঁ হযরত (সাঃ) এ বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়শা (রাঃ) আশ্চর্যান্বিত ছিলেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) নিজের সহজ হিসাবের কথা কেন বলেন, অথচ তিনি হিসাব ছাড়াই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। সহী বুখারী কিতাব তফসীরুল কুরআন, সূরা ইযাস্সামা উন শাক্কাত বাবুন ফাসাউফা ইউহাসিবু হিসাবাঁ ইয়াসীরা'তে এই রেওয়ায়াতটি এসেছে। আমি দু'টি রেওয়ায়াত বেছে নিয়েছি যার বিষয়-বস্তু অভিন্ন তবে একটি অপরটিকে স্পষ্ট করেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বেওয়ায়াতেও আছে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, 'যার থেকে হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে'। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আপনার জন্যে কুরবান! আল্লাহ্তাআলা কি এটি বলেন নি যে, 'ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বেইয়ামিনিহী ফাসাওফা ইউহাসিবু হিসাবাঁ ইয়াসীরা'। আমি আপনার জন্য কোরবান, এটি কি কথা বলছেন, আপনার কথা 'সত্যি আপনি বলেছেন' যার হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তবে সেই সাথে কুরআনে এটিওতো বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বেয়ামিনিহী ফাসাওফা ইউহাসিবু হিসাবাঁ ইয়াসীরা' -যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে অনেক সহজ হিসাব নেয়া হবে। হুযূর (সাঃ) বলেন, এখানে হিসাবের অর্থ হচ্ছে আমল (কর্ম) সম্পর্কে অবগত করা, কিন্তু যার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে (আল্লাহ্তাআলা) কঠোরতা অবলম্বন করবেন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। সকলেরই হিসাব হবে কিন্তু একটি হিসাব হচ্ছে কেবল আমল সম্পর্কে অবগত করা। সেটি হচ্ছে 'হিসাবে ইয়াসীর'। তবে আমি যে বলছি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে-এর অর্থ হচ্ছে যার হিসাব-নিকাশে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মসনদ আহমদ বিন হাম্বল থেকে নেয়া অপর হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন, একদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নামাযরত অবস্থায় এই দোয়া করতে শুনেছি, 'আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবাঁ ইয়াসীরা'। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বার বার এই দোয়া নামাযে নিবেদন করছিলেন, 'আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবাঁ ইয়াসীরা' হে আল্লাহ্! আমার থেকে সহজ হিসাব নিও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (সাঃ) নামায থেকে অবসর হলেন তখন আমি তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম 'হে আল্লাহ্র রসূল! 'হিসাবে ইয়াসীরের অর্থ কী?' তিনি (সাঃ) বললেন, যার আমলনামা ভাসা (হাল্কা) দৃষ্টিতে দেখা হবে।

আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলেছি যে, এখানে যখন সীমান্ত অতিক্রম করা হয় তখন কতক পাসপোর্ট হাল্কা দৃষ্টিতে দেখা হয় (তদ্রূপ) তিনিও (সাঃ) দোয়া করেছিলেন যেন তার আমলনামাও হাল্কা দৃষ্টিতে দেখা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঁ হযরত (সাঃ) কেন ব্যাকুল ছিলেন? অথচ তিনি (সাঃ) জানতেন যে, যদি কেউ বিনা হিসাবে ক্ষমা পেতে পারে তাহলে তিনিই (ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য)। যদি কারো আমলনামা হাল্কা দৃষ্টিতে দেখার উপযোগী হয়ে থাকে তা কেবল হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আমলনামা ছিল। তাহলে তিনি কেন এ দোয়া করছেন যে, আমার হিসাব যেন সহজ হয়। এটির কারণ ছিল ঐ নম্রতা যা আঁ হযরত (সাঃ)-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। এই নম্রতায় একটি গভীর বাস্তবতা ছিল। তিনি (সাঃ) জানতেন যে, তিনিও আল্লাহ্তাআলার ফযল ছাড়া ক্ষমা পাবেন না। নিজের আমলের বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। কেননা তিনি (সাঃ) জানতেন আমলের সামর্থ্য তো আল্লাহ্তাআলা দিয়েছেন। নতুবা আমার এমনকি সামর্থ্য ছিল যে, আমি এমন কর্ম সম্পাদন করতে পারতাম। সুতরাং নম্রতা এবং কৃতজ্ঞতার মিশ্রণ তাঁকে (সাঃ) এ দোয়া করিয়েছে- "হে আমার প্রতিপালক! আমার হিসাব সহজ কর।" কেননা, যা কিছু আমি লাভ করেছি তা তুমিই তো দান করেছ। (এটি) তোমার দান কিন্তু আমি তোমার কৃতজ্ঞতা এবং বিনয়ের দাবী পূরণ করছি। আমি নিবেদন করছি যেভাবে এখানে অনুগ্রহ করেছ, সেখানেও (পরকালে) যেন অনুরূপ আচরণ হয়। সুতরাং সন্দেহের কারণে নয় বরং (খোদার সমীপে) কান্নাকাটির এটি একটি অংশ যেন বিনয় এবং কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা হয়।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) বলেন, হে আয়েশা! যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে ধ্বংস হবে। প্রত্যেক মুসীবত যা মু'মিনের উপর আসে এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তাআলা তার কোন না কোন ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। এমনকি যদি কোন কাঁটা বিঁধে তাহলে এর কারণে তার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। 'হিসাবে ইয়াসীর'এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন, যার দিকে সাধারণের দৃষ্টি পৌঁছাতে পারে না। তিনি (সাঃ) বলেন, মু'মিনের হিসাব তো এ পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়। মু'মিনের হিসাবে যদি একটি কাঁটাও প্রবেশ করে তবে কাঁটা ফোটার কারণে যে কষ্ট হয় তা যেন তার খারাপ কর্মের প্রতিফল, সে এখানেই পাচ্ছে। কেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বে তার হিসাব পূর্ণ করে সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয় যে, সে সহজ হিসাবের অধিকারী হয়ে গিয়েছে। কেননা পৃথিবীতে প্রত্যেক দুঃখ, কষ্ট, রোগ এবং যন্ত্রণা তার আমলনামায় প্রতিদান হিসেবে লিখে দেয়া হবে।

আপনি যদি মু'মিন হয়ে থাকেন আর এ বিষয়টিকে বুঝে নেন তাহলে পৃথিবীতে দুঃখের মাধ্যমে যে কষ্ট আপনি পাবেন সেগুলো আপনার খাতায় প্রতিদান হিসাবে লেখা হবে, আর কেয়ামতে হিসাবের কাঠিন্য থেকে আপনাকে রক্ষা করা হবে। এটি (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ। অথচ মানুষের দৃষ্টি এ অনুগ্রহের দিকে নেই। আমি বারংবার উপদেশ দিয়ে আসছি কিন্তু কতক লোক এগুলোতে আমল দিচ্ছে না। কোন প্রিয় ব্যক্তি যদি মারা যায়, কোন দুঃখের সম্মুখীন হয়, কোন কষ্ট পায় বা কিছু সম্পদ নষ্ট হয় তবে এমন হা-হুতাশ শুরু করে দেয় যেন এগুলো তাদেরই ছিল এবং তাদেরই এগুলোর উপর অধিকার। আল্লাহ্ যেন সব বিষয়ে তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করতে বাধ্য। এ ধারণার প্রেক্ষিতে তাদের কেয়ামতের আমলনামা নোংরা হয়ে যায়। তাদের 'হিসাবে ইয়াসীরা' (সহজ হিসাব)-এর তালিকা থেকে বের করে 'হিসাবে আসিরা' (কঠিন হিসাব)-এর তালিকায় প্রবেশ করানো হবে। এজন্য এ বিষয়টি খুলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। আঁ হযরত (সাঃ)-এর এ তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূত যুক্তি আমাকে বিষয়টি বুঝিয়েছি যা পরে আপনাদেরকে আমি বুঝাচ্ছি। (অর্থাৎ) মুমিনের এখানকার কষ্টসমূহ তার ঐখানকার (পরকালের) 'হিসাবে ইয়াসীর' (সহজ হিসাব)-এর জন্য প্রয়োজনীয়। খোদাতাআলার রাস্তায় যতবেশী পরীক্ষা আসে ততই পরকালে 'হিসাবে ইয়াসীর' নির্ধারিত হয়ে যায়। এ বিষয়টিকে বুঝলে দেখবেন যে, সকল নবীদের মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত কষ্ট, সমষ্টিগত কষ্ট, শত্রুর দিবা-রাত্রির নোংরা বাজে প্রলাপ, শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট। পৃথিবীতে এমন কোন নবী (-এর ইতিহাস) বের করে দেখান যাকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। এরপর 'হিসাবে ইয়াসীর' ছাড়া আর কি বাকী থাকে।

পৃথিবীতে কেউ বলতে পারবে না যে, আমাকে তো কষ্টের পরিবর্তে 'হিসাবে ইয়াসীর' দেয়া হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কোন্ পাপ মোচনের জন্য কষ্ট দেয়া হয়েছিল? কষ্ট এজন্য দেয়া হয় নি যে, তাঁর (সাঃ) পাপ মোচন করা হবে। কষ্ট এজন্য দেয়া হয়েছিল যেন তিনি (সাঃ) সমস্ত পৃথিবীতে আদর্শ স্থাপন করেন। এটিকে বলা হয় খোদাতাআলার রাস্তায় 'কাদেহুন ইলা রব্বিকা কাদহান ফা মুলাকিহী'– প্রত্যেক প্রতিবন্ধকতাকে আমি বীরত্বের সংগে অতিক্রম করেছি, রাস্তার প্রত্যেক আঘাত আমার কাছে ফুল মনে হয়েছে। এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় আমি সফলকাম হয়ে বেরিয়ে এসেছি। যদি তুমি চাও যে, তুমিও আল্লাহ্‌র সংগে সাক্ষাৎ কর তবে আমার রাস্তা অবলম্বন কর।

এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতক উদ্ধৃতি রাখছি যা এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবে। বিষয়টিতো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্পষ্ট করেই দিয়েছেন। তবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এটির সূক্ষ্ম পথসমূহকে পুনরাবৃত্তি করেছেন যেন আমাদের জন্যেও 'হিসাবে ইয়াসীর' (সহজ হিসাব)-এর ব্যবস্থা হয়।

গত খুতবায় আমি মিঃ ডিক্‌সন যিনি অষ্ট্রেলিয়ার পর্যটক ছিলেন তার কথা বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একদা প্রাতঃভ্রমণে গেলেন তখন (ঐ পর্যটকও তাঁর সাথে ছিলেন)। তাকে কিছু নসীহত করেন। তিনি (আঃ) যে নসীহত তাকে করেছিলেন তার মধ্য থেকে যেগুলো আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি সেগুলোর বিষয়-বস্তুর সংগে সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘ প্রাতঃভ্রমণ ছিল, হুযূর (আঃ) ডিক্‌সনের সংগে দীর্ঘ আলোচনা করছিলেন। এখন আমি যা বর্ণনা করতে চাচ্ছি এ বিষয়ের সংগে সে সমস্ত আলোচনার সম্পর্ক নেই। এজন্য আমি সেগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি। ঐ অংশকে বের করে আপনাদের সামনে রাখছি সরাসরি যার সাথে এ বিষয়-বস্তুর সম্পর্কে আছে "যে মানুষকে সহজ হিসাবের জন্য তৈরী করা হয়, সে এই পৃথিবীতে অবশ্যই পবিত্র জীবন লাভ করে।" এ পবিত্র জীবন ব্যতীত সে অন্য কোন পুণ্য আশা করতে পারে না। সুতরাং পাপ থেকে বেঁচে চলা এটি 'কাদহান ইলা রব্বিকা কাদহান'-এর ব্যাপার। কেননা, যখনই মানুষ প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর হয়ে পাপকে এড়িয়ে চলে তখন কিছু কঠোরতা অবলম্বন করে। পাপ থেকে বাঁচার জন্য কোন না কোন কষ্ট সহ্য করতে হয়। (এটি) নেক ব্যক্তিদের জন্য কম এবং পাপীদের জন্য বেশী হয়ে থাকে। নবীদের জন্য এ কষ্ট রহমত এবং স্বাদের কারণ হয়ে থাকে।

এখানে উপস্থিত যারা এ খুতবা শ্রবণ করছেন বা পরে শ্রবণ করবেন এমন সাধারণের কথা আমি এখানে বলছি। তাদের সবাইকে আমি বুঝাচ্ছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। এমন প্রতিদানের চিত্র অংকন করেছেন যেন মানুষের প্রকৃতিতে নিজেই সেদিকে ঝুঁকার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

সেই পবিত্র জীবন যা পাপ থেকে রক্ষার মাধ্যমে লাভ হয় সেটি একটি 'লা'লে তাবা' (অতি উজ্জ্বল মণি), 'লা'লে তাবা' সেই মণিকে বলা হয় যা অতি আলোকিত। প্রত্যেক মণি নিজের মধ্যে একটি চমক রাখে। কিন্তু উর্দু প্রবাদবাক্যে 'লা'লে তাবা' তাকে বলা হয় যা নিজের ভিতর অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য রাখে, যাতে পরিপূর্ণভাবে স্বচ্ছতা পাওয়া যায়। "একটি 'লা'লে তাবা' যা কারো নিকট নেই", তাহলে সকলেই কি এর থেকে বঞ্চিত? (এটির) অর্থ হচ্ছে, যে যুগে এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি একথা বলছিলেন সেই যুগে তিনি (আঃ) ছাড়া আর কারো কাছে ছিল না। একটি 'লা'লে তাবা' (অতি উজ্জ্বল মণি) যা কারো নিকট নেই কিন্তু হাঁ খোদাতাআলা সেই উজ্জ্বল মণি আমাকে দিয়েছেন। দেখুন! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শব্দগুলো কতটা সতর্কতাপ্রসূত। এটা বলেন নি যে, আমার নিকট আছে, এতে এক প্রকার অহংকার পাওয়া যায়। হাঁ, খোদাতাআলা সেই অতি উজ্জ্বল মণি আমাকে দিয়েছেন। খোদাতাআলা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন আমি বিশ্বকে সেই অতি উজ্জ্বল মণি লাভের পথ সম্পর্কে

অবহিত করতে পারি। তিনি দান করেছেন কিন্তু এজন্যে নয় যে, কেবল এটি আমার নিকটই থেকে যাক। এই উদ্দেশ্যে দিয়েছেন এবং আমাকে মনোনীত করেছেন যেন আমি সমস্ত বিশ্বকে সেই মণি লাভের পথ সম্পর্কে অবগত করি। আজ সমস্ত জামাত এবং অন্য যারা এখনও এ জামাতে প্রবেশ করেন নি, তারা এই নসীহতের উপরে চিন্তা করলে তারাও সেই 'লা'লে তাবা' লাভ করতে পারবেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লাভ করেছিলেন।

আমি দাবীর সংগে বলছি যে, "এই পথে চলে প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্য অবশ্যই এটিকে লাভ করবে।" পথটি কঠিন বটে কিন্তু বিশ্বাস কত দৃঢ়। ইন্নাকা কাদেহুন ইলা রব্বিকা কাদহান ফামুলাকিহী–ঐ আয়াতগুলোতে যে দৃঢ়তা রয়েছে তা এই লেখার মধ্যেও আছে। সেই মণি লাভ করা কষ্টকর কিন্তু যদি ঐ পথে চলো তবে অবশ্য আল্লাহ্তাআলাকে লাভ করা সক্ষম হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। যাতে (আল্লাহ্) লাভ হয়, সেই পথ এবং মাধ্যম একটিই আর তা হচ্ছে খোদার সত্যিকারের তত্ত্ব-জ্ঞান।

'প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম বিষয়। কেননা, (এটি) একটি কঠিন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।' সত্যিকার তত্ত্ব-জ্ঞানকে কঠিন বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি (আঃ) বলেছেন, সহজ এবং নিশ্চিত পথ বটে কিন্তু এটি একটি কঠিন বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি এই কাঠিন্যকে সহ্য করে নাও তবে অন্য সমস্ত কষ্ট সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এথেকে ভয় পেয়ে যাও তবে তুমি কোন কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

'প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম বিষয়। কেননা, (এটি) একটি কঠিন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত'। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি দার্শনিক আকাশ ও পৃথিবী এবং অন্য সৃষ্টিগুলোর ধারাবাহিকতা, উপস্থাপন ও সুরক্ষিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কেবল এই কথা বলে যে, 'কোন সৃষ্টিকর্তা হওয়া উচিত'। তবে এমন দার্শনিকও পৃথিবীতে অনেক কম যারা সমস্ত দিকে দৃষ্টি দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, কোন সৃষ্টিকর্তা পাওয়া উচিত। আমি এরিস্টটলের (Aristole) দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম যে, ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন তিনি খোদাতালার সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারা এ কথাটি বুঝেন না। তিনি সেই সমস্ত দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের কথা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এখানে বলছেন। তিনি (এরিস্টটল) যখন বিশ্ব-জগতের উপর চিন্তা করেছেন তখন এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই বিশ্ব-জগতের এক আদি কারণ (স্রষ্টা) থাকা উচিত। যে বিশ্ব-জগতের উপাদান থেকে সৃষ্টি হবে না, বরং তার থেকেই ঐ উপাদান তৈরী হবে যা সৃষ্টির মাধ্যমে হয়। সেই প্রথম কারণ (স্রষ্টা) ব্যতীত এই বিশ্ব-জগত সৃষ্টি সম্ভব নয়। এজন্যই এরিস্টটলকে আল্লাহ্তাআলা এক স্থায়ী সম্মান দান করেছেন। তিনি সত্যিকার দার্শনিক ছিলেন। বিষয়ের গভীরে গিয়ে ফল আহরণ করতেন। আজ পর্যন্ত কেউ এ ফলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে নি। আমি যখন এ ব্যাপারটি তার পুস্তকে দেখেছি তখন তার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর সম্মানের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যিকার দার্শনিক হলে আল্লাহ্তাআলা তাদের পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং ধারাবাহিকতা, উপস্থাপন ও সুরক্ষিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে 'আবলগ' (উপস্থাপন) এবং মহকম (সুরক্ষিত) অত্যন্ত ব্যাপক ও উচুঁ মানের বিষয়ে পরিপূর্ণ, মহকম যাকে নড়ানো সম্ভব নয়। (দার্শনিক) এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছতে পারে যে, কোন স্রষ্টা হওয়া উচিত। এই সংজ্ঞা এরিষ্টটলের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কেননা, তিনি কেবল এটি বলেছেন, স্রষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু এর সংগে কোন ব্যক্তিও সম্পর্ক স্থাপন করেন নি যা সক্রেটিস করেছিলেন যিনি এরিষ্টটলের জ্ঞান-দানকারী পূর্ব-পুরুষ ছিলেন। এটি অদ্ভুত কথা যে, অনেক সময় মানুষ কারো অনুবর্তিতা করে কিন্তু শতভাগ অনুবর্তিতা করে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তত্ত্বজ্ঞানের যে কথা বর্ণনা করেছেন তা কেবল বুঝাই যথেষ্ট নয়। কেননা, এরিস্টটলও সক্রেটিসের কথাকে বুঝেছিলেন এজন্য তার যুক্তি আগে বেড়েছে এবং তখন তিনি 'স্রষ্টা' হওয়া উচিত, এতটুকু বিষয় পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তবে সেটিকে (স্রষ্টাকে) জীবিত সত্তা মনে করে তার সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করার বর্ণনা এরিষ্টটলের জীবনে কোথাও উল্লেখ নেই। যদিও তিনি পরিচ্ছন্ন ও পাপমুক্ত ছিলেন, তবে তা কেবল ঐ অভ্যাসের কারণে যা সত্যতার কারণে অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানুষ যদি কোন উচ্চ সত্তায় বিশ্বাসী হয় বা না হয় (সত্যতার কারণে মানুষ এরূপ জীবনলাভ করতে পারে)। সত্যতা এমন একটি মৌলিক ও স্থায়ী গুণ যারই মধ্যে পাওয়া যাবে তারই মধ্যে ভদ্রতা সৃষ্টি করে দিবে। সেই ভদ্রতা তাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করবে কি করবে না এটি একটি ভিন্ন বিষয়। সুতরাং এরিষ্টটলের মধ্যে এই সত্যতার ভদ্রতা ছিল যার কারণে তার সমস্ত জীবন সৎ ও আদর্শপূর্ণ ছিল। কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চেয়ে আরো উন্নত মাকামে নিয়ে যেতে চান। তিনি (আঃ) বলেন, 'আমি এর চেয়ে আরো উঁচুতর মাকামে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দার্শনিকগণ পৌঁছাতে পারে না। তারা একটি জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আমি যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট (তাই) একটি উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যাচ্ছি এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, খোদা আছেন" অর্থাৎ মুলাকিহী-এর ওয়াদা এই পৃথিবীতেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যদিও এ আয়াতের উদ্ধৃতি তিনি (আঃ) দেন নি তথাপি বিষয়-বস্তু ঠিক অনুরূপই। সাক্ষাতের পর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। যদি এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎ না হয়ে থাকে তবে কীভাবে বলেন, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি'। একটি সাক্ষাততো সেটি যা কেয়ামতের দিনে অবশ্য অবশ্যই হবে। সেই সাক্ষাতের ভিত্তি এই পৃথিবীতেই রচিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে মানুষ জেনে নেয় যে, আমি আমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাৎ করছি। এই দৃঢ় জীবন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আনুগত্য এবং অনুসরণে লাভ হয়ে থাকে। এতে অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। যেভাবে আমি বলেছি, অনেকের জন্য সমস্ত জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম অথবা অনেকের জন্যে সমস্ত জীবনের পরিশ্রান্ত পরিশ্রম, দু'টোর মধ্য থেকে একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

এই কথাগুলোর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে প্রত্যাশা জামাত থেকে রাখেন তা আমি আপনাদের সম্মুখে পড়ে শুনাচ্ছি। তিনি (আঃ) বলেছেন যে, 'আমি যে রাস্তার দিকে ডাকছি যদি তোমরা আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী কর তবে নিজের সত্তার মাধ্যমে প্রমাণ করো যে, তোমরা আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত। যে রাস্তার দিকে আমি ডাকছি সে রাস্তায় যদি না চল তাহলে ঐ লা'লে তা'বা (অতি উজ্জ্বল মণি) যা আমি পেয়েছি পৃথিবীতো সেটাকে দেখতে পায় না কিন্তু

তোমাদের দেখে থাকে, সুতরাং তোমরা যদি সেই লা'লে তাবা না হও বরং নোংরা কয়লার ন্যায় হও তবে পৃথিবী কীভাবে বলবে যে, আমি সেই যুগ-ইমাম যার অনুসারীরা লা'লে তা'বা লাভ করেছে বা লা'লে তা'বায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তিনি (আঃ) বলেছেন, 'জামাতের সদস্যদের দুর্বলতার বা মন্দ নমুনার প্রভাব আমাদের উপর পরে। এটি মনে করবে না যে, তোমরা স্বাধীন এবং যেভাবে চাও সেভাবে জীবন কাটাবে আর তার প্রভাব আমাদের উপর পড়বে না'। এ প্রভাব পড়ার জন্যেই বাধ্য হয়ে জামাতের নেযাম থেকে বের করে দিতে হয়। অনেকে মনে করেন অযথা কঠোরতা অবলম্বন করা হচ্ছে। কখনো নয়, কঠোরতার কারণে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এজন্য যখন আমি দেখি কারো মন্দ আচরণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর প্রভাব ফেলছে এবং তাদেরকে দেখে মানুষ ভুল ধারণা করতে পারে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যখন ক্লান্ত হয়ে যাই আর দেখি তারা সংশোধনের জন্য তৈরী নয় তখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে জামাত থেকে বের করে দিতে হয়। তাদের জন্য যেন মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা না জন্মে। এটিই সেই কথা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্পষ্ট করেছেন। 'জামাতের সদস্যদের দুর্বলতা বা মন্দ নমুনার প্রভাব আমাদের উপর পড়ে। মানুষ অযথা আপত্তির সুযোগ পায়। সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে এটাই নসীহত যে, **নিজেকে উৎকৃষ্টতম এবং ভাল আচরণ প্রদর্শনকারী বানানোর চেষ্টায় নিয়োজিত থাক।**' চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা সম্পর্কে আমি বলছি যে, অনেকে একথা বলে (মন্দ ব্যক্তিদের) সকলকে জামাত থেকে বের করছেন না কেন? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'চেষ্টায় নিয়োজিত থাক' এজন্য ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে এমন চিহ্নাবলী দেখা যায় যে, তারা চেষ্টা করছেন এবং সংশোধনের দিকে ধাবিত হচ্ছেন, তাদেরকে জামাত থেকে বের করার কোন অনুমতি আমার নেই। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই শব্দগুলো আমার জন্য বিচারক। 'চেষ্টায় নিয়োজিত থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে বলা যেতে পারে যে, কেউ পবিত্র।' এই চেষ্টার পরিণাম হবে ফেরেশতাদের ন্যায় জীবন। এই জীবন সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে আয়াত উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে 'ইয়াফ আলুনা মা ইউ'মারুন'– ফেরেশ্‌তাদের ন্যায় অবস্থার অর্থ হচ্ছে, যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় তাই তারা করে থাকে। কেন, কীভাবে কী প্রকার এর প্রশ্ন উত্থাপন করে না। তিনি (আঃ) বলেন, 'যখন আমার জামাত এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, যা বলা হবে তাই করবে। তখন আমি বলতে পারব যে, এই জামাত ফেরেশতাদের মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছে। 'ফানা ফিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌তে বিলীন) হয়ে যাওয়া, নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনাকে ছেড়ে দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ এবং পরিকল্পনার অধীনস্থ হওয়া উচিত।' 'ফানা ফিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌তে বিলীন)-এর একটি বিষয় হচ্ছে, 'ইয়াফ আলুনা মা ইউ'মারুন (যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় তাই তারা করে) দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যা কঠিন রাস্তার সংগে সম্পর্কযুক্ত। ফেরেশ্‌তাদের সৃষ্টিই এরূপ করা হয়েছে– 'ইয়াফআলুনা মা ইউ'মারুন'। তাদের সাধ্য নেই যে, এটিকে অতিক্রম করে। তাদের গুণাবলীতে নিজের ইচ্ছায় রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা রাখা হয় নি। মানুষ যখন আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে সেই রাস্তা অতিক্রম করতে হয় সেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রব্বিকা কাদ্‌হা' তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে দু'টো সম্ভাবনা থাকে, পুণ্যের দিকে বা পাপের দিকে। এই হোঁচট রাস্তাকে অনেক জটিল করে দিয়েছে। তিনি (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে যাওয়া নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ ও পরিকল্পনার অধীনস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। **এই অধীনস্থতায় প্রত্যেক ব্যক্তি যে এই মর্যাদায় পৌঁছে বা পৌঁছানোর চেষ্টা করে তার দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ঘর এবং পরিবেশকে নিজের মত করার চেষ্টা না করে। নির্দেশাবলীর অধীনস্থ হওয়া নিজের জন্য, নিজের সন্তান-সন্ততি বিবি, বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন এবং আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়।**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার একথাগুলো নির্দ্বিধায় তাঁর (আঃ) ভালবাসার অশ্রুতে সিক্ত করে দেয়। কত পবিত্র, কত পরিপূর্ণ এবং চরম উৎকর্ষতা সম্পন্ন বাক্য। তিনি (আঃ) বলেন, "যদি তুমি অতি উজ্জ্বল মণি লাভ করে থাক তবে আমি যে রাস্তা প্রদর্শন করেছি সেই রাস্তায় চলতে আরম্ভ কর। এ পথে তোমার একা চলাই যথেষ্ট নয়। নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এবং পরিকল্পনাসমূহকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও পরিকল্পনার অধীনস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। নিজের সন্তান-সন্ততি, বিবি-বাচ্চা এবং আত্মীয়-স্বজন এদের সবার জন্য এই আদর্শই স্থাপন কর এবং তাদেরকে এই নসীহত কর। এদের সবার জন্য রহমতস্বরূপ হয়ে যায়," শেষে বলছেন "আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়ে যাও"। **হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যিনি আমাদের জন্য রহমতের কারণ ছিলেন, কেমন নম্রতার বাক্য উচ্চারণ করেছেন, 'যদি তোমরা এ কথার অনুভূতি রাখ যে, আমাকে খোদাতাআলা প্রত্যাদিষ্ট করে তোমাদেরকে কোন্ কোন্ কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, কেমন অপবিত্র রাস্তা থেকে মুক্ত করেছেন, কেমন পবিত্র রাস্তায় চালিয়েছেন তাহলে এগুলোর কৃতজ্ঞতার হক এভাবে আদায় কর যে, আমার জন্য রহমতের কারণ হয়। তোমাদের জন্য মানুষ যেন আমার জন্য রহমতের কারণ হও। তোমাদের জন্য মানুষ যেন আমার উত্তম আচরণসমূহকে লাভ করে নেয়, সেগুলোকে দেখে নেয়। তোমাদের মাধ্যমে যেন মানুষ জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে অতি উজ্জ্বল মণি দান করেছেন। তোমরা যখন মানুষকে আমার কাছে নিয়ে আসার মাধ্যম হবে, তখন তোমরা যেন আমার কাছে রহমতের কারণ হয়ে গেছ।'** অত্যন্ত সুন্দর ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ বাক্য। জামাতের সংগে যে ভালবাসা এবং দাবীসমূহ রয়েছে সেগুলোকে এই বাক্য পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট করছে। বিরুদ্ধবাদীদের মোটেও আপত্তির সুযোগ দেয়া উচিত নয়। আল্লাহতা'লা বলছেন, "ফা মিনহুম যালিমুন লি নাফসিহী ওয়া মিনহুম মুকতাসিদুন ওয়া মিনহুম সাবিকুম্ বিল খায়রাত" (সূরা ফাতের) অর্থ হচ্ছে-মিনহুম যালিমুল লিনাফসিহী- তাদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে স্বীয় আত্মার জন্য নিজের উপর যুলুম করে। অবিকল, 'কাদহুন ইলা রব্বিকা কাদ্‌হা'-এর বিষয়। মানুষ স্বীয় আত্মার জন্য নিজের উপর যুলুম করে। যেভাবে মা-বাচ্চার জন্য দৃশ্যতঃ বাচ্চার উপর যুলুম

করে। একজন শিক্ষক ছাত্রের জন্য দৃশ্যতঃ তার উপর যুলুম করে। কঠিন কাজ নেয়, এত বাড়ীর কাজ দেয় যে, তার জন্য ঘরেও আরাম করার সুযোগ থাকে না। এটি হচ্ছে 'যালিমুল লি নাফসিহী -এর বিষয়। প্রত্যেক মানুষ নিজের উৎকর্ষের জন্য স্বীয় নফসের সংগে এমন কঠোর আচরণ করতে পারে, তবে এটি হবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্য। 'ওয়া মিনহুম মুকতাসিদুন' এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তুলনামূলকভাবে মধ্য পন্থা অবলম্বনকারী। অর্থাৎ কিছু যুলুম করে আবার কিছু যুলুম করেও না। খোদাতাআলা যতটুকু তৌফীক দেন ততটুকু ভারসাম্যের সাথে অগ্রসর হয়। 'ওয়া মিনহুম্ সাবিকুম বিল খায়রাত' এবং তাদের মধ্যে কতক এমন রয়েছে যারা পুণ্যে সবাইকে পিছনে ফেলে যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কথায় (এই আয়াতের) প্রথম দুটো বৈশিষ্ট্য নিম্ন পর্যায়ের। যালেমুল লি নাফসিহী এবং মুকতাসিদ-এর বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের। 'সাবিক বিল খায়রাত' হওয়া উচিত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন ভাল বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি (আঃ) বলেন, মুকতাসিদ এবং যালেমুল্ নাফসিহী এবং মুকতাসিদ-এর বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের। 'সাবিকুম বিল খায়রাত' হওয়া উচিত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন ভাল বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি (আঃ) বলেন, মুকতাসিদ এবং যালেমুন্ লি নাফসিহী-নিজের জায়গায় ভাল গুণ। তবে এগুলোর সাথে 'সাবিকুম বিল খায়রাত' মিলে যাওয়া উচিত। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করছেন। সাধারণতঃ এটি মনে করা হয় যে, 'সাবিকুম বিল খায়রাত' একটি সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ। এই ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব জায়গায় ভাল এবং ঐ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জায়গায় ভাল। আমি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ লেখা প্রথমবার পড়ে এই বাস্তবতাকে বুঝি যালেমুন্ লি নাফসিহী এবং মুকতাসিদ তখন খোদাতাআলার দরবারে গ্রহণীয় হবে যদি তারা সাবিকুম বিল খায়রাত-ও হয়। সাবিকুম বিল খায়রাত ঐ দু'টো থেকে পৃথক কোন নতুন বিষয় হতে পারে না। সুতরাং আমার ব্যাখার পর যদি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখাকে মনযোগ সহকারে শুনেন তবে আপনি ভাবটি বুঝতে পারবেন। "প্রথম দু'টো বৈশিষ্ট্য নিম্ন পর্যায়ের সাবিকুম বিল খায়রাত হওয়া উচিত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন ভাল বৈশিষ্ট্য নয়। দেখ! জমা পানি অবশেষে নোংরা হয়ে যায়।" সুতরাং নিজের আত্মার উপর যুলুমকারী যদি দুই-এক বার পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে ঐ ব্যক্তি নয় যে, সফলতা লাভ করতে পারে। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী কিছু সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে সে কখনো পুণ্যকে লাভ করতে পারবে না। তিনি (আঃ) বলেন, "তার জন্য আবশ্যক সে যেন (তার সফর) জারি রাখে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন ভাল বৈশিষ্ট্য নয়। দেখ! জমে থাকা পানি অবশেষে নোংরা হয়ে যায়, কাদার সংমিশ্রণে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হয়ে যায়।" পানি এমনিতে ভাল জিনিস। যে রূপে এই দু'টো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে কিন্তু পানি জমে গেছে এইজন্য কাদার সৃষ্টি হয়েছে। কাদার সংমিশ্রণে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হয়ে যায়। প্রবাহমান পানির নিচে কাদা থাকা সত্ত্বেও সবসময় ভাল, পরিচ্ছন্ন এবং স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে। কাদা সেটির উপর কোন ক্রিয়া দেখাতে পারেনা। তত্ত্ব এই কথাটি সবার বুঝা প্রয়োজন। আমরা যারা অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারি নি এবং খোদাতালার সাধারণ বান্দা তারা যেন নিজের সত্তার ভিতর কাদা দেখে ভয় না পায়। কাদা থেকে পবিত্র হওয়া অনেক পরের কথা। যদি তারা প্রবহমান পানিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকেন তবে তাদের আত্মার কাদা তাদের কর্মকে নোংরা করতে পারবে না। তাদের (থেকে) দুর্গন্ধ আসবে না বরং সুগন্ধ আসবে। এমন স্বাস্থ্যকর পানি হবে যা মানুষ পান করবে, সতেজ হবে এবং আনন্দিত হবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কত সূক্ষাতিসূক্ষ্ম উপমা দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, পাপ এবং পুণ্যের বাস্তবতা কী? খোদাতাআলার নিকট কোন কথাটি গ্রহণীয়। "প্রবহমান পানির নিচে কাদা থাকা সত্ত্বেও সবসময় ভাল, পরিচ্ছন্ন এবং সু-স্বাদু হয়ে থাকে।" তিনি আঃ) 'উসমেভী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অধিকাংশের মধ্যে (কাদা) থাকে না। কত সূক্ষ্ম ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, খোদাতাআলার এমন পবিত্র বান্দাও আছেন যাদের মধ্যে কাদা থাকে না। তবে অনেকের মধ্যে কাদাও থাকতে পারে। এজন্য আমি কয়েকবার জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার প্রত্যেক শব্দে থেমে গভীর চিন্তার প্রয়োজন নতুবা আপনি এর সূক্ষ্ম বিস্ময়কে লাভ করতে পারবেন না। এক একটি শব্দ মুক্তার মত, যেখানেই লেগে আছে সেখানেই সেটি লেগে থাকা উচিত ছিল। সেটির নিচে কাদা থাকা সত্ত্বেও কাদা সেটির উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। একই অবস্থা মানুষেরও। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। এই অবস্থা ভয়াবহ। সব সময় কদম আগেই বাড়ানো প্রয়োজন। পুণ্যে উন্নতি করা উচিত নতুবা খোদাতাআলা মানুষের সাহায্য করেন না। পুণ্যে উন্নতি করা উচিত নতুবা খোদাতা'লা মানুষের সাহায্য করেন না-ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়েরু মাবি কওমিন হাত্তা ইউগাইয়েরু মাবি আন ফুসেহিম'-এর বিষয় যা অন্য শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তৌফীক না দিলে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে মানুষ চেষ্টা না করে যদি মনে করে আল্লাহ্ আমাকে নেক করে দিবেন, এটিও ঠিক নয়। চেষ্টার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এই সেই চেষ্টা যার সম্পর্কে মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "সব সময় পা আগেই রাখা প্রয়োজন, পুণ্যে উন্নতি করা উচিত নতুবা খোদাতাআলা মানুষকে সাহায্য করেন না"-এটি একটি বাস্তব কথা। যে ব্যক্তি পুণ্যের দিকে ধীরগতিতে চলে তা সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই গায়েব (অদৃশ্য) থেকে সাহায্য করা হয়। কোন জিনিস থেমে নেই যখন সেটি থেমে যাবে তখন Stagnant' (নিস্তেজ) হয়ে যাবে। এটির মধ্যে কাদা সৃষ্টি হতে থাকবে। তখন সেটি কাদার দিকে অগ্রসর হবে। নোংরা থেকে অতি নোংরা হয়ে যাবে। এটি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। যত নোংরা কাদা রয়েছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন দেখবেন যত বেশী স্থির হয়ে থাকে ততই সেটি দুর্গন্ধ থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত হতে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "নতুবা খোদাতাআলা মানুষকে সাহায্য করেন না। এভাবে, মানুষ নূর (জ্যোতি:) শূন্য হয়ে যায়। যার ফল অনেক সময় 'ইরতেদাদ' (ধর্মত্যাগী) হয়ে থাকে। এভাবে মানুষের অন্তরে আবরণ পরে যায়"। সুতরাং এটি থেমে থাকার ফলাফল। অনেক সময় 'ইরতেদাদ' অবলম্বন করে থাকে, আবার অনেক সময় তা হয় না,

কিন্তু অন্তঃকরণে আবরণ পরতে থাকে। এ কারণে চক্ষুষ্মানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এজন্য আবশ্যক নয় যে, কেবল ইরতেদাদকারীই জামাত থেকে বের হবে বরং অনেকে জামাতে থেকেও জামাত থেকে বের হয়ে যায়। এই উদ্ধৃতিটি মলফুযাত পঞ্চম খন্ড ৪৫৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

এমন আমি যে উদ্ধৃতি পড়তে যাচ্ছি তা তবলীগে রেসালত দশ খন্ডের পৃঃ ৭২-৭৫ এর থেকে নেয়া হয়েছে। "পুণ্য-কর এবং খোদার রহমতের প্রত্যাশী হও"। এই একটি বাক্যে এমন অনেক ব্যক্তির অবস্থা খুলে দেয়া হয়েছে যারা পুণ্য করে না। আর তারপরও রহমতের প্রত্যাশী হয়। দুভার্গ্যবশতঃ পৃথিবীর অধিকাংশই এমন। মুসলিম দেশসমূহ এমন মৌলভী দ্বারা পরিপূর্ণ যারা এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, পুণ্য না করে রহমতের প্রত্যাশী হও। আল্লাহ্‌তাআলা রহমতকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল, বারবার ক্ষমাকারী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শাফায়াত করবেন–এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কখনো এমনটি হবে না। কুরআনের আয়াতের উপর দৃষ্টি রেখে মসীহ মাওউদ (আঃ) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা ছাড়া আর কোন বাস্তবতা নেই। 'পুণ্য করো এবং খোদাতাআলার রহমতের প্রত্যাশী হও'। পুণ্য করে কেন আপনি নিজে নিজেই পরিত্রাণ পেতে পারেন না। এটিও একটি প্রশ্ন। 'পুণ্য করো এবং খোদাতাআলার রহমতের প্রত্যাশী হও'-এর অর্থ হচ্ছে পুণ্যের প্রতিদান রহমত ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি বা একজন কৃষকের দৃষ্টান্ত নিন, যে জমিতে ভাল চারা রোপণ করে; যদি সে খোদাতাআলার রহমতের প্রত্যাশী না হয় আর কেবল নিজের মেহনতের প্রত্যাশী হয় তাহলে অনেক সময় তার চারা বা ফসল ফল দেয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। আর এমনও হয় যে, ফল আসে কিন্তু সে ফল তিতা হয়ে থাকে। চারা নিজের জায়গায় ভাল হলেও অনেক সময় এমন বিষাক্ত ফল দেয় যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাদামকে দেখুন যে, এটি একটি কত ভাল নেয়ামত। মিষ্টি বাদাম মানুষ নিজের স্মৃতি–শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। এছাড়া আরো অনেক ফায়দা রয়েছে কিন্তু বাদাম যদি তিতা হয়ে যায় তাহলে তাতে এমন এক বিষের সৃষ্টি হয় যার থেকে শক্তিশালী বিষ পৃথিবীতে আর নেই। অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে যায়। যেহেতু এটির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হয়ে থাকে এজন্য এটি খাওয়া মানুষের পক্ষে কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর কারণ হয় না। হলেও যৎসামান্য হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এটি বলা যে, খোদাতাআলার রহমতের প্রত্যাশী হয়ে যাও- এটির অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পুণ্য কোন ফল না নিয়ে আসে, আর আল্লাহ্‌তাআলার রহমত এতে শামিল না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন ভাল ফলের প্রত্যাশী হতে পার না। খোদাতাআলার দিকে পূর্ণ শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হও। যদি এমন না কর তবে অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় আর্তনাদের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির দরজা পর্যন্ত উপনীত হও। (হযরত মসীহ মাওউদ-আঃ) যারা পুণ্য করতে পারেন না কিন্তু ব্যাপক বাসনা রাখে। তাদের করুন চিত্র অংকন করেছেন। খোদাতাআলার সমীপে পৌঁছার শক্তি নেই কিন্তু এ শব্দগুলিতে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তা তাদের জন্য একটি পথ-নির্দেশনার আলো হিসাবে কাজ করে। বাকী ইনশাল্লাহ্‌ আগামী খুতবায় আলোচনা করব।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ-মাওলানা বশীরুর রহমান
সদর মুরব্বী

শোক সংবাদ

❑ জনাব আবু জাফর খাদেম (৬০ বছর), পিতা মরহুম গোলাম সামদানী খাদেম, মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে বারডেম হাসপাতাল ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তিনি শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস ও বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

❑ জনাব আব্দুল মন্নান (৮৫ বছর), পিতা মরহুম মুন্সী ওয়াজউদ্দিন (তারুয়া), মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ১৯শে এপ্রিল সোমবার রাত ৯-৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। তিনি মৃত্যুকালে ১ ছেলে ৬ মেয়ে, নাতী-নাতনী ও অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

উভয় মরহুমকে তিতাস নদীর পারে আহমদীয়া জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আমরা উভয়ের রূহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ্‌ তাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। সকল ভাইবোনের কাছে তাদের রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য আবেদন করছেন জনাব শেখ মোশাররফ হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত।

২৭শে মে খেলাফত দিবস পালন করুন

সাতাশে মে তারিখটি আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে খেলাফত দিবস নামে বিখ্যাত। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ২৬শে মে ইহলীলা সংবরণ করেন। ২৭শে মে তারিখে দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ ঘটে অর্থাৎ আহমদীয়তের প্রথম খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত হাজীউল হারামাঈন শরীফাঈন হাফেয হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে। এ দিনটি পালন করে বিশেষভাবে নবাগত ও নব-প্রজন্মকে দিনটির তাৎপর্য বুঝাতে এবং ইসলামী খেলাফতের স্বরূপ, খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে সভা-সমিতির আয়োজন করে যথারীতি রিপোর্ট প্রদানের জন্যে সকল জামাতকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ ৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর
রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. N0. 59 • 20th Issue April 30, 1998 Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

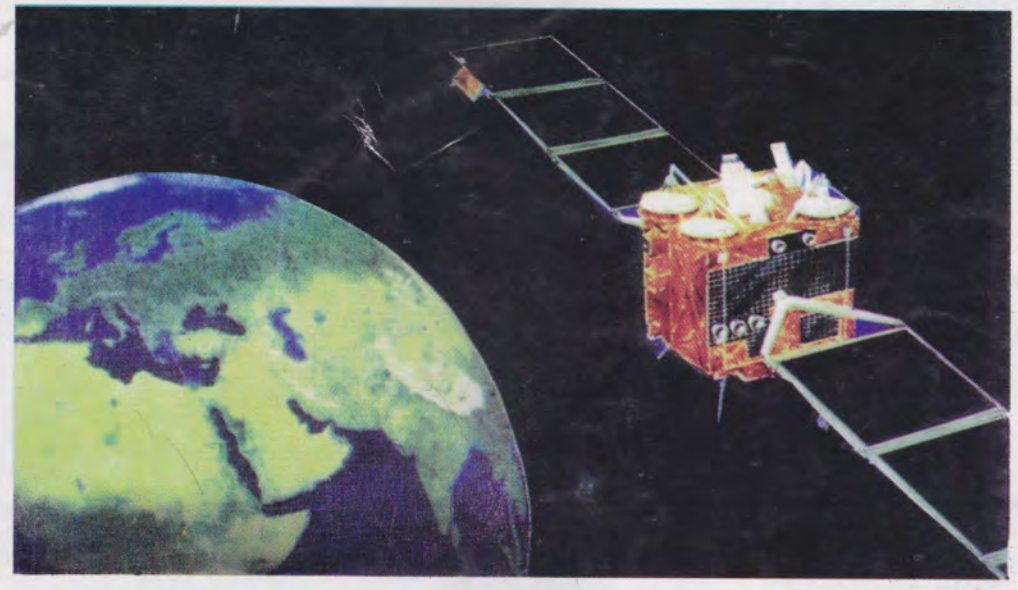

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ MTA একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।
- প্রতিদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সহিত প্রশ্নোত্তর সেশন 'লিকা-মাআল আরব' দেখুন।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272